Smritir Alookbortika

স্মৃতির আলোকবর্তিকা
(Smritir Alookbortika)
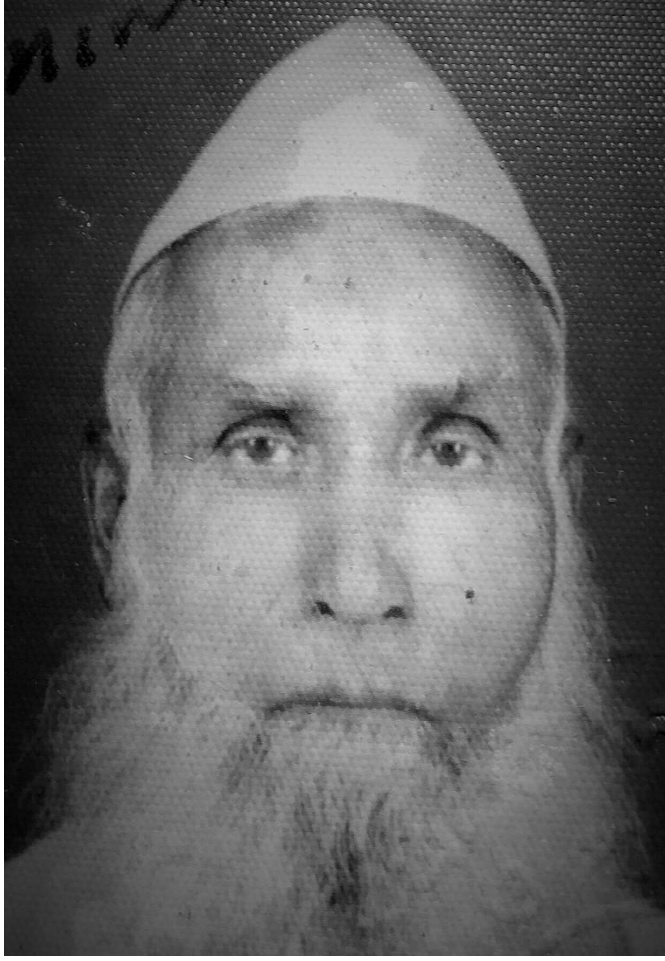
প্রফেসর মৌলভী মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী

লেখক – অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হিফজুর রহমান চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণ; সংশোধিত এবং সম্পাদিতঃ ২০২৪

প্রথম প্রকাশঃ একুশে বইমেলা ঢাকা ২০১৮
প্রকাশকঃ মোঃ ওবায়দুল্লাহ্
হবিগঞ্জ প্রকাশনা, ৫১, ৫১/এ, পুরানা পল্টন
ঢাকা–১০০০

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হিফজুর রহমান চৌধুরী (রুকন) ১৯৫২ সালের পহেলা জানুয়ারি মাতুলালয় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার দরিয়াপুর সাহেববাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শুরু হয় পিতার কর্মস্থল তখনকার মহকুমা শহর সুনামগঞ্জে। পিতা প্রফেসর মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী ভাইস-প্রিন্সিপাল, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হিসাবে সুনামগঞ্জ কলেজে দীর্ঘ কর্মময় জীবন শেষে ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে পরিবার পরিজন নিয়ে হবিগঞ্জ শহরের নিউ-মুসলিম কোয়ার্টার এলাকায় বসবাস শুরু করেন। লেখক সুনামগঞ্জ এইচ, এম, পি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী হাই স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে এস, এস, সি এবং সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে এইচ, এস, সি পাশ করেন। অতঃপর সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে এম, বি, বি, এস ডিগ্রী লাভ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল অফিসার হিসাবে চাকুরী শুরু করেন। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে মেডিকেল অফিসার এবং পরে প্রাক্তন আই, পি, জি, এম, আর এবং পি, জি হাসপাতাল (বর্তমান বি, এস, এম, এম, ইউ ও হাসপাতাল), ঢাকায় এ্যানেস্থেটিষ্ট এবং পরে ই, এন, টি বিভাগে সহকারী রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৫ সালে আই, পি, জি, এম, আর এবং পি, জি হাসপাতাল, ঢাকা থেকে নাক, কান, গলা এবং হেড-নেক সার্জারি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমাপ্ত করেন। অতঃপর সরকারী চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে তিনি সৌদি আরব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকুরীতে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ, ঢাকায় সহকারী অধ্যাপক ই,এন, টি হিসাবে যোগ দেন। পরে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে সিকদার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এবং অধ্যাপক ই, এন, টি এন্ড হেড-নেক সার্জারি শাহাব উদ্দিন মেডিকেল কলেজ, গুলশান, ঢাকা থেকে চাকুরী জীবন সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি শুধু চেম্বার প্র্যাকটিস করছেন। তিনি ভারত, চীন, সৌদি আরব, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। তিনি কয়েকবার ওমরাহ্‌ হজ পালন সহ পবিত্র হজ্জব্রতও পালন করেছেন। তিনি এক মেয়ে এবং দুই ছেলের জনক। ছেলেমেয়ে সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

সূচীপত্র

লেখকের কথা

পিতা-মাতা সবার কাছেই অতি প্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন। তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার সোপান বেঁয়ে সন্তানের বেড়ে উঠা। সেই শৈশব থেকে অনেক অনেক মায়া, মমতা আর যত্ন আত্তি নিয়ে তাঁরা আমাদের লালন পালন করেন, বড় করে তোলেন। জীবনের প্রতিটি পদে এবং মুহূর্তে আমাদেরকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে দিক নির্দেশনা দেন। আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাল-মন্দ অনেক কিছুরই গঠনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পিতা-মাতার জীবনাচারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শৈশবে বাড়ীতে পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সামাজিক রীতিনীতি, আচার আচরণ এবং শিক্ষা দীক্ষাই আমরা অনেকাংশে আজীবন লালন করে চলি। সন্তানদেরও দায়িত্ব থাকে পরিণত বয়সের মা-বাবার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাঁরা যখন ইহজগৎ ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি জমান তখন তাঁদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে দোয়া করা। মহান আল্লাহ্-পাক রাব্বুল-আলামিন পবিত্র কুরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে আমরা মরহুম পিতামাতার জন্য দোয়া চাইব; "রাব্বি আরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি ছাগিরা" হে আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামিন আমাদের পিতামাতার প্রতি রহম-দিল হও ঠিক সেইভাবে যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাদের পরম স্নেহ মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ ধর্ম মতে পিতা-মাতাকে স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এখন অখণ্ড অবসর। যদিও ডাক্তারদের অবসর বলতে কিছু নেই। এক সময় প্রতিষ্ঠা, নাম ও যশের পিছনে রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে হয়েছে। এখন আর নিয়মমাফিক অফিসে যাওয়া আসার বালাই নেই। তাই হাতে অফুরন্ত সময়। অনেক অতীত সুখ দুঃখের স্মৃতি হাতরে বেড়াই। আমার পিতার পুন্যময় জীবনের অনেক অনেক স্মৃতি বেশি মনে পড়ে। উনার সহজ সরল জীবন যাপন, রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা, মানবতার প্রতি উপলব্ধি ও দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে উনার স্বচ্ছ ও সঠিক বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী ধর্মাচারঃ পালন আমাকে অভ্রান্ত পথের দিক নির্দেশনা দেয়। এক সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পিতার গর্বিত সন্তান হিসাবে ভাল লাগার অনুভূতি জাগায়। আমি লেখক নই। কখনো কিছু লিখব তাও ভাবিনি। তারপরেও কাঁচাহাতে আমার এই ভাল লাগার অনুভূতি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার জন্যই আমার পিতাকে নিয়ে দু-কলম লিখতে বসেছি। মহান ইসলাম ধর্মের আদর্শে উজ্জীবিত সংবেদনশীল মানবিক ধ্যান ধারণা কিন্তু আধুনিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ উনার জীবন যাপন বর্তমান অস্থির সময়ে হয়ত আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। আমরা সবাই যেন মহান আল্লাহ্-তায়ালার হেদায়েত প্রাপ্ত হই। আমার পিতা প্রফেসর জনাব মোঃ নজিরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব ১৯১৭ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের মাতৃভূমি পূর্ব-বাংলার তিনবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। যার প্রভাব আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক

জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তাই সঙ্গত কারণেই উনার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তাই সংক্ষিপ্ত আকারে এই তিন কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে। সেই পরাধীন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পাকিস্তান আমলের নামে মাত্র স্বাধীনতার আড়ালে ঔপনিবেশিক যাঁতাকল পাঁড় হয়ে আমাদের বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সব সময়েই তিনি অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত সংখ্যা গরিষ্ঠ জন-গুষ্ঠির স্বার্থে পরিচালিত রাজনীতিকে সমর্থন করেছেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং আমার পিতার কর্মস্থল বাংলাদেশের প্রান্তিক শহর সুনামগঞ্জের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজনীতি এবং সুনামগঞ্জের মুক্তি পাগল ছাত্র-জনতার যুদ্ধের ঊষালগ্নে অতি গৌরবময় প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষেপে যতটুকু স্মৃতিতে আছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা করেছি।

পরাধীন এই উপমহাদেশে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ-বিত্তে পিছিয়ে পরা স্ব-জাতির মুসলমান ভাইবোনদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তখনকার সময়ে আরও দশজন শিক্ষিত মুসলমান তরুণের মত মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর অপরিণামদর্শিতা ও ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনার কারণে পূর্ব-বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণকে আশাহত এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। নানা টালবাহানায় জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর প্রতি অনীহা সহ আর্থসামাজিক অবহেলার শিকার পূর্ব-বাংলার সর্ব স্তরের জনগণ আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। তিনিও একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে এসব আন্দোলন সংগ্রামের নৈতিক সমর্থক ছিলেন। তারপর সত্তোরের সেই ঐতিহাসিক নির্বাচন। সেই নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীর অভূতপূর্ব বিজয়ের পরেও বাঙালি নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি, বাঙালীর সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এবং এর পরিণতিতে নয় মাসের অবরুদ্ধ ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনাকারী পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর লক্ষ শহীদের রক্ত ঝড়িয়ে, অগণিত মা-বোনদের ইজ্জত হানি এবং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও দুর্দশার বিনিময়ে, পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয়া আমাদের দেশ, আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীন গর্বিত জাতি।

স্বাধীন বাংলাদেশ আমলেও নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা অব্যাহত আছে। স্বাভাবিক ও জন-বান্ধব রাজনীতি এখনো সর্বোতভাবে রাজনৈতিক দলগুলো চর্চা করতে পারেনি। অনেকাংশে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্ভর রাজনৈতিক চর্চার কারণে সৎ, ভালো এবং ন্যায়পরায়ণ নাগরিকেরা আস্তে আস্তে রাজনীতি বিমুখ হয়ে পরছেন। এক সময় অধিকাংশ রাজনীতিবিদেরা জনগণ তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। সমাজের প্রতিভাবান এবং আদর্শ ব্যক্তিরা রাজনীতিতে জড়িত থাকতেন। কিন্তু আজকাল রাজনীতি অনেকের কাছে নগদ

অর্থকড়ি প্রাপ্তির পেশা হওয়ায় এবং পার্থিব অনৈতিক অনেক কিছু লাভের সহায়ক হওয়ার কারণে এর ব্যাপ্তি আজ সর্বত্র। ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ অপ-রাজনীতির এই অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার অশুভ এবং অসুস্থ লড়াইয়ের পরিণতিতে হানাহানি ও প্রাণহানি পাকিস্তানি আমলের অপশাসনের স্মৃতি মনে করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। প্রতিশ্রুত জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকারী নীতি প্রণয়নে বিলম্বের কারণে মনঃক্ষুন্ন হয়ে বলতেন যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। তারপরেও আশা ছাড়েননি। মনে করতেন আমদের নিজেদেরই এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে হবে। আমরা সবাই যেহেতু এই সমাজে বসবাস করি তাই এর সমাধানে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। মেধাবী, ভাল এবং যোগ্য মানুষদের সর্বক্ষেত্রে সুযোগ করে দিতে হবে অথবা ভাল লোকদের নিজে থেকে এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্তরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে আমরা হয়ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিকলাঙ্গ ও বিধ্বস্ত সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা রেখে যাব। প্রত্যাশা করতেন একদিন সবকিছু সাধারণ জনমানুষের কল্যাণে নিবেদিত হবে। অগণিত মা বোনের ইজ্জত, সম্ভ্রম হানি ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বৃথা যাবে না। আশা করতেন পরিশীলিত গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষে কঠিন সময় পার করেও এক সময় সুশাসন নিশ্চিত-কারী জনগণের সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সমাজের নানাবিধ সমস্যা, অসঙ্গতি ও রাজনৈতিক দুরবস্থা এই লেখায় উল্লেখিত হয়েছে। কিছুকিছু ক্ষেত্র হয়ত আমরা নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অন্য নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করতে পারলে এধরনের সমস্যা দূর করনে সহায়ক হতে পারে। আমরা বাঙ্গালীরা অতি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন। সর্বত্রই শুধু রাজনৈতিক আলোচনা। অতি সামান্য বিষয়েও আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। সামাজিক অনেক কর্মকাণ্ড যা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে করা যায় সেক্ষেত্রে সরকারের মুখাপেক্ষী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নাগরিকদের দায়িত্ববোধ এবং সচেতনতা তৈরিতে সামাজিক সংগঠন এবং বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগীরাও ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্য বই পুস্তকে সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে মনিষীদের উপদেশ মূলক লেখনি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্কুল কলেজের ছাত্র সমাজকে সচেতন করতে পারে। তথ্য মন্ত্রণালয় এলক্ষ্যে একই ধরণের বিষয়বস্তু ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করে সাধারণ জনগণকে এই ব্যাপারে সচেতন করতে উদ্যোগ নিতে পারে। উন্নত দেশের মত এলক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশই সরকারকে কঠোর হতে হবে। ভোটের রাজনীতির কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব এড়িয়ে চললে হবে না। আইন প্রয়োগে কঠোরতা অবলম্বনের সাথে সাথে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ব্যাপক প্রশিক্ষণ হয়ত একসময় এই অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে পরিত্রাণের উপায় হবে। আমার পিতা নজিরউদ্দিন সাহেব কর্ম জীবনের দীর্ঘ সময় (১৯৪৪ থেকে ১৯৮১ সাল) সুনামগঞ্জ শহরে অতিবাহিত করেছেন।

উনার সন্তানদের অনেকের জন্ম, শৈশব, কৈশোর এবং যুবা বয়সের কিছুটা সময় ওখানে কেটেছে। তিনি এবং আমরা উনার সন্তানেরা সেখানকার অনেক ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত। একটি জনপদ শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে না। এর ঐতিহ্য গঠনে রয়েছে অনেকের অবদান। সুনামগঞ্জের রয়েছে গৌরবময় অতীত। তাই সবার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখেই ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তানি আমলের রাজনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। শ্রদ্ধা নিবেদনই উদ্দেশ্য। অন্যদের অবমূল্যায়ন করতে নয়।

প্রচার বিমুখ আমার মামাবাড়ির (দরিয়াপুর সাহেববাড়ী, হবিগঞ্জ) অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বকে নিয়েও প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করেছি। তাঁরা শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না উন্নত মনের ও মানসিকতার মানুষও ছিলেন বটে। আমার বিশ্বাস মানুষ তাঁর জন্মে নয় কর্মেই মহীয়ান হয়। তাঁর পরেও প্রচলিত ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে এই বইয়ে আমাদের বংশ পরিচয় (উজিরপুর চৌধুরী-বাড়ী, হবিগঞ্জ) আমি যতটুকু জানি এবং মুরুব্বীদের থেকে শুনেছি সন্নিবেশিত করেছি। তবে অতীতাশ্রয়ী নয় অতীত জানা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ দোষের কিছু নয়। আমার বিশ্বাস অনেক পরিবারেই পুরনো দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত আছে। শতাব্দীরও অধিক সময়ের পুরনো ব্রিটিশ ভারতীয় আমলে আমার দাদা জনাব মুনির চৌধুরী সাহেব এবং পর-দাদা সর্ব-জনাব সরফ চৌধুরী সাহেবের সময়ে সম্পাদিত দুর্লভ কয়েকটি দলিল আমাদের সংরক্ষণে থাকায় স্ক্যান কপি প্রকাশিত করা হলো। এতে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকের নাম ও তাদের খরিদ-কৃত তালুকের নম্বর সহ পরগণা ও মৌজার নাম উল্লেখ আছে।

নজিরউদ্দিন সাহেব শিক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী এক সচ্ছল পরিবারের সদস্য হয়েও নিরহংকারী ছিলেন। ধর্মীয় মূল্যবোধে বিবেককে চালিত করে নির্লোভ অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন। সর্বোচ্চ ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করেও অসাম্প্রদায়িক উচ্চ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। সংসার জীবনে তিনি যেমন খুবই স্নেহশীল দায়িত্ব-পরায়ণ তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সব সময়েই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নিপীড়িত সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় থাকতেন এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন। অন্যায় অবিচার চোখে পরলে নিজের সাধ্যমত প্রতিবাদ করতেন এবং প্রতিকার চাইতেন। মানুষকে ঘৃণা করতে যেমন শিখেননি এবং তেমনি অন্যদেরও শিখাননি। ধর্মকর্মেও তিনি একজন সহিষ্ণু নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করতেন না। এমনকি নিজ ধর্ম মতের কেউকেই ধর্মীয় আচার অনুশাসনের জন্য জোর জবরদস্তি করা পছন্দ করতেন না। স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম শিক্ষা এবং ধর্মকর্ম পালনকরাকে প্রাধান্য দিতেন। মুসলমান ভাইদের জন্য পরিচালিত নিজ ধর্মের অজ্ঞতা দূরীকরণে তবলীগ জামাতের কার্য্যক্রমের

অনুসারী ছিলেন। অবশ্য তবলীগ জামাতের কার্য্যক্রমের পরিধি এখন আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও তবলীগের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হচ্ছেন। সাড়া বিশ্বে এখন শান্তির ধর্ম ইসলামের এক অস্বস্তিকর কঠিন সময় চলছে। মহল বিশেষ নিজেদের মত করে আমাদের মহান ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে বিশ্বময় মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করতে লিপ্ত রয়েছে। সমাজে পরমত সহিষ্ণুতা যেমন লোপ পাচ্ছে তেমনি নিজস্ব ভ্রান্ত মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে হত্যার ন্যায় নির্মমতা বেছে নেয়া হচ্ছে। এই নির্মমতা থেকে নিজ ধর্মমতের নিরীহ লোক সহ অসহায় নারী শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না। সমাজে তাই আজ নজিরউদ্দিন সাহেবের মতাদর্শের লোকের বড় প্রয়োজন। সন্তান হিসাবে আমি উনাকে যেভাবে দেখেছি সম্পূর্ণ নির্মোহ হয়ে আমার উপলব্ধি ব্যক্ত করেছি। এতে কোন অতিরঞ্জন নেই। কাউকে আঘাত কিংবা সম্মান হানির চেষ্টা করা হয়নি। তারপরেও কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আমি সবিনয়ে ক্ষমা-প্রার্থী। কোন ভুলক্রুটি বা তথ্য বিভ্রাট কারো নজরে এলে উল্লেখিত ই-মেইলে dr.h.r.choudhury@gmail.com. যোগাযোগ করা হলে পরবর্তী সংস্করণে সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

একুশে বইমেলা'১৮ সময়কালে স্মৃতির আলোকবর্তিকা বইটির প্রথম মুদ্রিত কপি সম্মানিত পাঠকের জন্য প্রস্তুতের পর অনেকেই বিশেষকরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা আগ্রহ নিয়ে অনেক মুদ্রণ প্রমাদ সত্তেও সম্পূর্ণ বইটি পড়েছেন। অনেকেই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমার পিতাকে নিয়ে লেখা হলেও সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে নিরপেক্ষ ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখনীর কারণে তাঁদের কাছে বইটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। অনেকেই আমার এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং লেখালেখির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে বলেছেন। আমি হয়ত অতটা প্রশংসার পাওয়ার যোগ্য নই। সবাইকে আমার স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাবোধ জানাই। তবে কয়েকজনের কথা এখানে না বললেই নয়। শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার চৌধুরী, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব বাংলাদেশ সরকার বইটি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছেন। তিনি ফোনে তাঁর ভাল লাগার অনুভূতিটা আমাকে জানিয়াছেন। তিনি কিছু সংশোধণী উত্থাপন করেছেন। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়ায় এই সংস্করণে বিষয়গুলো সংশোধণ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের সুপরিচিত সুলেখক, হবিগঞ্জ ডাইরেক্টরি যার লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছ এবং যিনি আরো কয়েকটি বইয়ের প্রণেতা আমাদের হবিগঞ্জের কৃতি সরকারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব আনোয়ার চৌধুরীও বইটি পড়ে ফোনে আমাকে উনার উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। বন্ধুবর বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরু, এডভোকেট সুনামগঞ্জ-বার ফোনে বইটি লেখার জন্য সুখবোধ জানিয়েছেন। আরেক সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনামুল হক চৌধুরী প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিভিশন বইটি পড়ে খুবই অভিভূত হয়েছেন এবং নিজ গ্রামের হাই স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের পড়ার সুবিধার্থে স্কুল পাঠাগারে বইটি দান করে দিয়েছেন। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। দেশ বিদেশে সুপ্রিয় পাঠকের কাছে বইটি আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এর ই-সংস্করণের উদ্যোগ

নিয়েছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই শ্রম ও ক্ষুদ্র প্রয়াসকে স্বার্থক করে তুলেন।

পূর্ব কথা

অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ তখন পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার অধীন। তবে এই সাম্রাজ্যের সূর্য আস্তে আস্তে অস্তাচল-মুখি হতে শুরু করেছে। পরাধীনতার এই গ্লানি থেকে মুক্তি আর খুব বেশি দূরে নয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এরই মধ্যে বিদ্রোহ ও আন্দোলন নানাভাবে দানা বেধে উঠেছে। যদিও ওই সমস্ত বিদ্রোহ এবং আন্দোলন তেমন একটা সফলতা পায়নি। তারপরেও বলা যায় জনসাধারণ শৃঙ্খলিত এই শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে জেগে উঠতে শুরু করেছে। দেশীয় মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজ ও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে অধিকার সচেতন হতে শুরু করেছেন। তারাই পরাধীনতার এই শিকল উপড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনতার নূতন প্রভাতের সূচনা করবেন। প্রায় দুই শত বছরের ব্রিটিশের অধীনস্থ গোলামীর শাসনের অবসান এখন শুধু আর সময়ের ব্যাপার মাত্র। চাই শুধু জন-নন্দিত শিক্ষিত নেতৃত্ব।

উনিশ শতকের শেষ তিন চার দশক থেকে এদেশীয় তরুণদের মধ্যে যুগোপযোগী ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই শিক্ষা গ্রহণ করে তরুণদের কেউ কেউ যেমন সরকারের বিভিন্ন পদের চাকুরীতে যোগ দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ আলোকিত করছিলেন আবার অনেকে বিভিন্ন পেশাধারী শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। অর্থ বিত্ত নাম ও যশের পাশাপাশি তারা নিজ নিজ পরিবারের সম্মান এবং অবস্থানও দৃঢ় করতে সক্ষম হন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে আরও অধিক সংখ্যক তরুণ শিক্ষা গ্রহণের এই ধারার সাথে যুক্ত হন। এদের অনেকেই পরবর্তীতে স্বজাতির অধিকার ও রাজনীতি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এরাই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বাঙালী হিন্দুরা অর্থ বিত্তে সামর্থ্য-বান বেশি হওয়ার কারণে বাঙালী মুসলমানদের থেকে সর্বদিক থেকে বেশ এগিয়ে ছিলেন।

মুসলমান তরুণ সম্প্রদায় যখন ধর্মীয় শিক্ষার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন হিন্দু সমাজ তখন ইংরেজদের অনুসৃত নীতি ও পথে চলে আধুনিক শিক্ষার সুফল ভোগ করছিলেন। তুলনামূলক অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সংকীর্ণতার আঁকড়ে আবদ্ধ প্রচলিত মোল্লা-তান্ত্রিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহার অন্যতম

প্রধান কারণ ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম উলামাদের সক্রিয় বিরোধিতা ও ফতুয়া-বাজীর কারণে তখনকার সময়ে অনেক মেধাবী মুসলমান তরুণ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। তবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে গঠনমূলক সামাজিক আন্দোলন মুসলমান তরুণদের মানস-পটে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে শুরু করলে তরুণ সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হতে থাকেন।

এর অল্পকাল পরেই ব্রিটিশ রাজত্বের অধীন দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হলে দেশীয়দের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রদেশে আইন সভা গঠন এবং সংখ্যালঘু মসলমান ও হিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভার সদস্য সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র ভোটাভোটির মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় হিন্দু মুসলমান সদস্য সমন্বয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা আরও সহজতর হয়। আরো পরে সরকারী চাকুরীতে কোটা প্রথা চালু করা হলে পিছিয়ে পরা সংখ্যালঘু মুসলমানদেরও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই জন্য বাংলার তখনকার মুসলিম নেতাদের বিশেষ করে নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব-বাংলাকে আলাদা প্রদেশ করা হয় এবং ঢাকা এর রাজধানীর মর্য্যাদা পায়। কিন্তু কয়েক বছর পরেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক আন্দোলনের ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হয়। অনেক বরন্যে হিন্দু নেতা, কবি ও সাহিত্যিক এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। হিন্দু নেতাদের হয়ত ধারনা হয়েছিল বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে কলিকাতা ভিত্তিক উচ্চবর্ণ, ধনাঢ্য ও শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সমাজ ব্যবস্থার ইতিমধ্যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, তা ব্যহত হবে। ঢাকায় আরেকটি সমান্তরাল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পেলে কলকাতা গুরুত্ব হাড়িয়ে ফেলবে। ক্ষুদ্র গুষ্টি স্বার্থে পরিচালিত এই আন্দোলনের কাছে একসময় ব্রিটিশ সরকার পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তবে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের পুরস্কার হিসাবে ব্রিটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে পূর্ববাংলা ও আসামের সিলেট অঞ্চলের সংখ্যাগুরু পশ্চাৎপদ মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের নিম্ন বর্ণের সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম হয়।

বৃহত্তর সিলেট বাংলার অবিচ্ছেদ্য বাংলা ভাষাভাষী জন-গুষ্ঠির অঞ্চল এবং ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকা বিভাগের অধীন ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং মাঝে বঙ্গ-ভঙ্গের কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান এবং ভারত হওয়ার আগ পর্যন্ত সিলেটকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সময়ে সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে অনেক ওলি, আউলিয়া, কুতুব- মাশায়েখের আগমনে বৃহত্তর সিলেট ভূমি ধন্য হয়েছে। হযরত শাহজালাল (র: আঃ) এর আগমনের মধ্য দিয়ে এর শুভ সুচনা হয়। এই আউলিয়া, কুতুবগন মূলত মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ইরাক এবং মোগল ও নবাবী আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সিলেটে এসেছেন।

অনেকাংশে আরবীয় বংশোদ্ভূত এই সমস্ত মহান ধর্ম প্রচারকগন সংসার-ধর্ম পালন করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে এদের উত্তরপুরুষগণ এতদঞ্চলের মানুষ ও সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। এদের বংশধরগণ এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিয়ে সিলেটে এক সময় একটি দৃঢ় ও সচ্ছল মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠে। নবাবী আমল এবং এর পরবর্তী ব্রিটিশ আমলে হিন্দু মধ্যবিত্তের মত মুসলমান এই মধ্যবিত্ত সমাজ আরও ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সচ্ছল ও শিক্ষিত ছিলেন। তবে তাঁরা আধুনিক শিক্ষা ও নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্য লাভের প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন। এরা প্রধানত আরবী ও ইসলাম ধর্মে বুৎপত্তি সম্পন্ন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে স্বল্পসংখ্যক এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে এরাই দলেদলে আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এতে আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পরা সিলেট অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সূচনা হয়।

জন্ম ও শৈশব

সেই নবজাগরণের যুগে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বানিয়াচং উপজেলার অন্তর্গত কিং-কুরশা পরগণার উজিরপুর গ্রামের এক বনেদী মুসলিম পরিবারে মৌলভী মোঃ নজিরউদ্দিন চৌধুরী জন্ম গ্রহন করেন। এই পরিবারের আদি পুরুষ আরব থেকে আগত একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে এদেশে আগমন করেন এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত দিনারপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। উক্ত দরবেশের বংশের উত্তরপুরুষ; শুকুর মোহাম্মদ অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করে উজিরপুরে স্থানান্তরিত হয়ে বসতি করেন। শুকুর মোহাম্মদের অধঃস্থন এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের পিতামহ (দাদা) সর্ব-জনাব মোঃ সরফ চৌধুরী ওরফে শরাফত মিয়া সাহেব নামজাদা জমিদার ছিলেন। তিনি অনেক জমিজমা বিল মহাল সহ প্রভূত সহায় সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং এলাকায় মান্যবর ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেবের মাতামহ (নানা) দাদারই আপন চাচাত ভাই মৌলানা মোঃ দেলোয়ার চৌধুরী সাহেব মাদ্রাসা শিক্ষিত প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম ছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা সহ তিনি বানিয়াচং রাজ পরিবারের ধর্ম ও আরবীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেখানকার জামে মসজিদেরও ইমাম ছিলেন। গোলাভরা ধানচাল আর বাড়ীর সামনেই ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরের নিজস্ব বিলের মাছ এবং মিরাস-দারীর আয়ে পিতা মোঃ মনির চৌধুরী সাহেব ও মাতা নবীজুন্নেছা চৌধুরীর ছিল তিন ছেলে ও এক মেয়ের সচ্ছল পরিবার। তাই মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে ও মায়া মমতায় বেড়ে উঠেছিলেন নজিরউদ্দিন সাহেব।

উজিরপুরের চৌধুরী পরিবার

হবিগঞ্জ জেলায় এক অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী পরিবার হিসাবে উজিরপুরের চৌধুরীদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এই খ্যাতি আরও বিকশিত করার পেছনে মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন নজিরউদ্দিন সাহেবের দাদা সর্ব-জনাব মোঃ সরফ চৌধুরী ওরফে শরাফত মিয়া সাহেব। তিনি সেই যুগে লেখাপড়া জানা বিচক্ষণ, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বৈষয়িক জ্ঞান সম্পন্ন বহুল পরিচিত লোক ছিলেন। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন। উজিরপুরের পশ্চিমের হাওর এবং পূর্বদিকে ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরে উনার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। ব্যাপক বিস্তৃত এই ভূ-সম্পদের দাপ্তরিক কাজে কর্মে উনার পরিবারের সদস্যদের বানিয়াচং, নবীগঞ্জ, বাহুবল এবং হবিগঞ্জ থানা সদরে ছুটাছুটি করতে হয়েছে এবং হয়। অতিথি বাৎসল্য এবং পথিক মুসাফিরদের যত্ন-আত্তির জন্য এই পরিবারের বেশ সুনাম ছিল।

উজিরপুরের ভূ-অবস্থানগত কারণে হবিগঞ্জ থেকে নবীগঞ্জ স্থল অথবা নৌপথে চলাচল করতে হলে উজিরপুর হয়েই যেতে হয়। ব্রিটিশ আমলের শেষ সময়ে হবিগঞ্জ থেকে নবীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলেও তা ছিল যান চলাচলের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। তাছাড়া যানবাহনও তখন একেবারেই ছিল না। শুষ্ক মওসুমে কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে ব্যক্তিগত যানবাহনে চলাফেরা করতেন। নিকট অতীতেও তাই সড়ক পথে পায়ে হেঁটে অথবা বর্ষাকালে নৌকাই ছিল ঐদিকে চলাচলের একমাত্র মাধ্যম। সময় লাগত কয়েক ঘন্টা। যারা অনেক দূরদূরান্ত থেকে যাত্রা শুরু করেছেন এবং গন্তব্য আরও অনেক দূর তাঁরা যাত্রাপথে বিরতি বা বিশ্রাম নিতে পারলে অনেকটা স্বস্তি বোধ করতেন। দূর দূরান্তের আত্মীয়স্বজন এবং মুসাফির অনেকেই তখনকার দিনে তাই উজিরপুর যাত্রা বিরতি দিয়ে চৌধুরীবাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। পরিবারের কোন শরিকের কিভাবে আত্মীয় সেটা বিবেচ্য বিষয় ছিল না। মেহমানকে পরমাত্মীয় ভেবে আদর আপ্যায়ন করাটাই ছিল মুখ্য। সেসময়ে সকল সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার এধরনের অতিথি পরায়ণতাকে সামাজিক সৌজন্য বোধ এবং দায়িত্ব মনে করতেন। এজন্যে অত্র অঞ্চলের অনেক পরিবারের সাথে উজিরপুরের চৌধুরীদের আত্মীয়তা ছাড়াও সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এক সময় এই চৌধুরী পরিবারের এলাকায় যথেষ্ট সুনাম এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সবাই স্নেহ করত এবং সম্মানের চোখে দেখত। চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শারীরিক গঠন ও আকৃতির কারণে অনেক অপরিচিত লোকও সহজেই তাদের চিনে ফেলতে পারতেন। গাত্র বর্ণ শ্যাম অথবা ঘন শ্যাম বর্ণের হলেও অধিকাংশ সদস্যের মুখের আদল ছিল খুবই কমনীয়, সাথে সরু উন্নত নাসা। কারো নাসিকা আবার ঈগল পাখির মত চোখা এবং বাঁকানো। সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠব। পায়ের পাতা বেশ ছোট। খুব কম সদস্যেরই পায়ের জুতার মাপ ছয় নম্বরের অধিক ছিল। নজিরউদ্দিন সাহেবের পায়ের মাপ আরও ছোট ছিল। তিনি সাড়ে পাঁচ নাম্বারের জুতা পরিধান করতেন। এলাকায় গ্রামের বাড়ী উজিরপুর জানলে সাধারনত কোন পরিবারের সদস্য

তাহা আর কেউ জানতে চাইতেন না। হবিগঞ্জ থেক নবীগঞ্জ পর্যন্ত আশপাশের সবাই এই পরিবারের সদস্যদের শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলতেন। বিশেষকরে নজিরউদ্দিন সাহেবের বড় ভাইয়ের বেশ নামডাক ছিল। তিনি বিচার বিবেচনা সম্পন্ন সদালাপী লোক ছিলেন এবং গ্রামীণ সালিশ বা বিচার বৈঠকে উপস্থিত থেকে সুবিচার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকতেন। হবিগঞ্জ থেকে সড়ক পথে উজিরপুরের দূরত্ব প্রায় সাড়ে সাত মাইল। এই পথটুকু যেতে এক সময় দুদুটি নদী পারাপারে গোদারা (খেয়া নৌকা) ব্যবহার করতে হত। প্রথমটি হবিগঞ্জের শহরতলীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত খোয়াই নদী পারাপারে এবং অন্যটি প্রায় আড়াই তিন মাইল পরে বালি-খাল এলাকায়। এই দুই খেয়াঘাটে ঘটনাচক্রে উজিরপুর চৌধুরীবাড়ীর কোন সদস্যের পরিচয় জেনে গেলে খেয়া সংশ্লিষ্ট লোকজন পারাপারে ভাঁড়া নিতে চাইতেন না। উপরোন্ত কিভাবে খাতির যত্ন ও অপ্যায়ন করা যায় তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পরতেন। একই অবস্থা হত বর্ষাকালে নৌপথে চলাচল কালে। মাঝিরা দামদর সাব্যস্ত করতে আগ্রহী হতেন না। কারণ তারা জানতেন এই পরিবারের সদস্যরা কাঙ্ক্ষিত ভাড়া থেকে তাদের বেশিই দিবেন। আবার কখনো গয়নার/ভাড়ার নৌকায় উঠলে পরিচয় জেনে গেলে মাঝিরা মুড়া বা অন্য কিছু দিয়ে আলাদা বসার ব্যবস্থা করে দিতেন। এটা অনেক সময় বিব্রতকর এবং অস্বস্তি-করও ছিল। এই ধরণের পরিস্থিতি এড়াতে তাই এই পরিবারের অনেকেই পরিচয়দানে বিরত থাকতেন। তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই শ্রদ্ধাবোধ অনেকাংশে উক্ত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ন্যায়নিষ্ঠ জনসম্পৃক্ততারই স্বাক্ষর বহন করে।

আজকাল অবশ্য এই ধরণের পরিবারতান্ত্রিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের বালাই নাই। আগের সম্মানিত লোকদের এখন আর কেউ স্মরণ করে না। বর্তমান প্রজন্ম এই ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। এখন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাই পরিচয়ের বড় মাপকাঠি। বড় কোন দলের বড় কোন নেতার অথবা সাংসদের অথবা উপজেলা চেয়ারম্যানের কিংবা নিদেনপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের আশীর্বাদ-পুষ্টরাই গ্রামীণ এলাকায় এখন মান্যবর। তাঁদেরকেই এলাকার লোকজন নানা কারণে ভয় এবং ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা পোষণ করে চলে। তবে এদের সবাই যে বিতর্কিত তা নয়। অনেকেই জন কল্যাণে নিবেদিত থেকে সবার আস্থা ও শ্রদ্ধা ভাজন হয়ে আছেন। আগে যেখানে পায়ে হেটে অথবা নৌকায় হবিগঞ্জ কিংবা নবীগঞ্জ থেকে উজিরপুর যাতায়াতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগত, সেখানে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে এবং পর্যাপ্ত যানবাহন থাকার কারণে সড়ক পথে এখন সময় লাগছে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট আর নৌপথ নাব্যতা হারানোয় বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। তাই অতি স্বল্প সময়ে কে কখন কোন দিক থেকে আসছে যাচ্ছে কারো কোন খবর কেউ রাখে না।

হবিগঞ্জ নামাকরন ও প্রাচীন জনপদ বানিয়াচং

ওলি-আউলিয়ার দেশ-খ্যাত হবিগঞ্জে মুসলমান সামন্ত রাজা/ভূস্বামীদের যাত্রা শুরু হয় হযরত সৈয়দ নাছির উদ্দিন সিপাহসালার কর্তৃক তরফ বিজয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি সিলেটের আরেক আধ্যাত্মিক সাধক ও ইসলাম ধর্মের তাপস শিরোমণি হযরত শাহ জালাল (র:) এর সমসাময়িক ছিলেন। দিল্লীর সেসময়ের বাদশাহ/সুলতান কর্তৃক নানাবিধ কারণে সেকান্দর শাহের নেতৃত্বে হযরত শাহ জালাল ও সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসলার এর সমন্বিত সৈন্য বাহিনী ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়াতে শ্রীহট্ট/সিলেট এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিলো। সিলেট বিজয়ের পর সৈয়দ নাছির উদ্দিন সিপাহসালার তরফ-রাজ আচাক নারায়ণকে পরাজিত করে এতদোঞ্চলে (হবিগঞ্জ) মুসলমান শাসন ব্যবস্থার অগ্রযাত্রার সূচনা করেন। হবিগঞ্জ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছিল তখনকার তরফ রাজ্য। নাছির উদ্দিন সিপাহসালারের অধঃস্থন বংশধরগণ পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশে ভাগ হওয়া তরফের জমিদারী প্রাপ্ত হন।

সুলতানশীর সৈয়দ বংশীয় জমিদারগণ ভাগ হওয়া তরফের জমিদারদের অন্যতম। হবিগঞ্জ নামের প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় তরফ পরগণার সুলতানশীর জমিদার সৈয়দ হাবিবউল্লাহ্ খরস্রোতা খোয়াই নদীর পাঁড়ে বাজার বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। বাজার আস্তে আস্তে জমে গেলে এর চারপাশ ঘিরে যে জনপদ গড়ে উঠে সেটাই একসময় হবিবগঞ্জ নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে হবিবগঞ্জই হবিগঞ্জ নামে রূপান্তরিত হয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকারের সময়ে হবিগঞ্জ মহকুমার স্বীকৃতি পায়। স্বাধীন বাংলাদেশে হবিগঞ্জ বর্তমানে একটি জেলা। বানিয়াচং হবিগঞ্জের একটি উপজেলা। ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ আমলের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত বানিয়াচং একটি থানা হিসাবে পরিচিত ছিল। এই উপজেলা বা থানার অধিকাংশ এলাকা নীচু তাই একে ভাটি অঞ্চল বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

সুদূর অতীতে স্থানীয় হিন্দু সামন্ত রাজার রাজধানী ছিল বানিয়াচং সদর অঞ্চল। এই রাজধানীকে ঘিরে একসময় বিশাল এক জনপদ গড়ে উঠে। বর্তমান সময়েও কয়েকটি ইউনিয়ন সমন্বয়ে বিশাল এই জনপদ বিস্তৃত। বাংলাদেশ-ত বটেই এশিয়ার বৃহত্তম গ্রাম বা জনপদ এটি। প্রাচীনকালে ভাটি অঞ্চল যথাঃ হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার বৃহদাংশ এবং সুনামগঞ্জ জেলার অধিকাংশ লাউর রাজ্যের অধীন ছিল। বানিয়াচং ও লাউরের তৎকালীন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল বানিয়াচং। উক্ত রাজার অধঃস্থন বংশধরগণ পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। এখনো এদের উত্তরপুরুষগণ বানিয়াচং সদরে বসবাস করছেন। বিশাল ভূসম্পত্তি থাকার কারণে এই পরিবারের সদস্যদের প্রচুর আয় রোজগার ছিল। কথিত আছে খাজনা আদায় অথবা অন্যান্য উৎস হতে আয় তখন ধাতব মুদ্রায় বিনিময় হত এবং প্রচুর পরিমাণে ধাতব মুদ্রা বিভিন্ন খাজাঞ্চীখানায় জমা হত। এত সমস্ত মুদ্রা পরিবহনে সেসময় কোশা নৌকা (ডিঙ্গি নৌকা)

ব্যবহার করা হত। ব্রিটিশ আমলে এই পরিবারের কোন কোন শরিকেরা কোশা নৌকার পরিসংখ্যান দিয়ে পরিচিত ছিলেন। যেমন ষোল কোশার শরিক। ধাতব মুদ্রায় অর্জিত আয় ষোলটি কোশা নৌকায় পরিবহণ করে সদরে জমা দেওয়া হত। পরবর্তীতে এই পরিবারের অধঃস্তন বংশধরেরা অর্থনৈতিকভাবে আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়েন। অনেকেই জায়গা সম্পত্তি হারাতে থাকেন। বানিয়াচং এবং সুনামগঞ্জের বেশিরভাগ জমিদার, মিরাসদার, জোতদার এবং তালুকদারেরা উক্ত রাজ পরিবারের সদস্যদের থেকে পাট্টা-মূলে খরিদ-কৃত অথবা তাদের কোন শরিকের নির্ধারিত সদর জমা/রাজস্ব সময়মত আদায়ে ব্যর্থতার কারণে নিলামে উঠা তালুক ক্রয়ের মাধ্যমে ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।

উজিরপুর ও এর পারিপার্শ্বিক নান্দনিক রূপ

পুরনো দলিল দস্তাবেজ থেকে উজিরপুর ও এর আশপাশের এলাকার মৌজা ও তালুকগুলোতে মুসলিম মালিকানার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই ধারণা করা হয় উজিরপুর নামকরণ হয়ত নবাবী আমলের কোন প্রভাবশালী পদস্থ মুসলমান আমাত্যের স্মৃতির সম্মানে রাখা হয়েছে। যতদূর জানা যায় প্রথম থেকেই উজিরপুর সম্পূর্ণই একটি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম। উজিরপুর বানিয়াচং থানার অধীন হলেও থানা সদর থেকে প্রায় বার মাইল পূর্ব-দক্ষিনে নবীগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ থানা এলাকার মোহনায় হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ সড়কের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উক্ত সড়কটি নবীগঞ্জ আউশ-কান্দি সংযোগ সড়কের মাধ্যমে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে গিয়ে মিলেছে। এই সড়কটি এখন ঢাকা থেকে হবিগঞ্জ হয়ে সিলেট যাবার বিকল্প আঞ্চলিক মহাসড়ক। সড়কটি পুরো উজিরপুর গ্রামের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। বর্তমানে এই সড়ক দিয়ে অনেক যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও পায়ে হেঁটেই হবিগঞ্জ সদর কিংবা নবীগঞ্জ যেতে হত। এক সময়ের খরস্রোতা শাখা বরাক নদী গ্রামের পূর্ব দিক থেকে খুব কাছ দিয়েই বয়ে গেছে। এই নদী নবীগঞ্জের দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খোয়াই সহ অন্যান্য নদীতে গিয়ে মিশেছে। যাতায়াতের জন্য বিদ্যমান এই দুই ব্যবস্থা উজিরপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিশেষ সুবিধা অতীতেও যেমন ছিল এখনো আছে। তবে বর্তমানে পলিমাটি জমে নদী ও খালগুলো ক্রমশ নাব্যতা হারানোয় এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও অনেক অনেক উন্নততর হওয়ার কারণে নৌপথ ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। গ্রাম বাংলার চিরায়ত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়ে রেখেছে উজিরপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। চারিদিকে শুধু সবুজের সমাহার। উত্তর-দক্ষিনে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো একটি অপরটির বেশ নিকটবর্তী। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম দিকে ভূতল ক্রমশ ঢালু হতে হতে বিশাল বিশাল হাওরে গিয়ে মিশেছে। তাই গ্রামগুলো একটি থেকে আরেকটি অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এতটাই দূরবর্তী যে খালি চোখে কোন গ্রামের অস্তিত্বই ধরা পড়েনা। শুষ্ক মওসুমে দিগন্ত-জুরে ফসলী জমি ভরে থাকে গাঁঢ় সবুজ কচি ধান গাছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ধান গাছের কচি ডগা ঢেউয়ের

মত করে একটির উপর আরেকটি হেলে পরে প্রকৃতিতে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য একে দেয়। মোহিনীয় সেই দৃশ্য সীমাহীন মুগ্ধতায় আটকে দেয় পথিকের দৃষ্টি। আবার কয়েক মাসের ব্যবধানেই গাঁড় সবুজ রং বদল হয়ে সোনালী ধানে ফসলের মাঠ ভরে উঠে। কৃষক তাঁর শ্রম সার্থক হওয়ায় হবে উৎফুল্ল আর পথিক দৃষ্টিনন্দন এই দৃশ্য অবলোকন করে হবে অভিভূত। এটাই আমাদের বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান গাছের দুই ভিন্ন অতি মনোহর রূপ। উজিরপুর সংলগ্ন সড়ক থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করে পশ্চিম দিকে তাকালে দিগন্ত জুরে আরও একটি পুরো ও গাঁড় কখনো সবুজ কখনোবা নীল লম্বা রেখা সব ঋতুতেই পরিলক্ষিত হয়। এই রেখা দূর থেকে দেখতে খুবই সুন্দর এবং রোমাঞ্চকরও বটে। রেখাটি বহু দূরে বানিয়াচং গ্রামের/জনপদের অস্তিত্ব জানান দেয়। এখন নুতন নুতন অনেক গ্রাম গড়ে উঠায় আগের মত এই রেখা আর ততটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। বানিয়াচং একসময়ের গ্রাম বর্তমানে উপজেলা সদর, ঐতিহ্যবাহী অতি প্রাচীন এক জনপদ।

বর্ষাকালে যখন চারিদিকে শুধুই অথৈ পানি আর পানি তখন এই এলাকার ভিন্ন আরেক সুন্দর রূপ দৃশ্যমান হয়। হাওরগুলো কানায় কানায় পানিতে ভরপুর হয়ে যায়। অগাধ জলরাশির এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য থেকে তখন চোখ ফেরানো সত্যি কঠিন। গ্রামগুলো দূর থেকে দেখে মনে হবে বুঝিবা পানিতে ভাসমান একেকটি দ্বীপ। বহু দূরে বানিয়াচং গ্রামের ছায়া রেখাটি তখন আর স্পষ্টভাবে পানিতে ভাসমান প্রতীয়মান হয়। হুহু করা শব্দে বয়ে যাওয়া বাতাসে হাওরের পানিতে সৃষ্ট স্নিগ্ধ ধবল ঢেউগুলো একটির উপর আরেকটি মৃদু গর্জনে আছড়ে পরতে থাকে। দূরে তখন পাল তুলা নৌকাগুলো এদিক ওদিক ছুটে চলেছে। আবার প্রকৃতি যখন শান্ত, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না তখন মনে হবে দিগন্ত জুরে বিশাল এক রুপালি চাঁদর যেন এই অগাধ জলরাশিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সূর্যরশ্মি হাওরের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব সব রঙের মোহিনীয় ও খুবই উপভোগ্য দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা করে। সূর্য্য কিরণ আর পানির এই রঙের বিচ্ছুরণ খেলা সত্যি অপূর্ব। কখনো সোনালী আবার কখনো চিকচিকে রুপালি আলো পানির চাঁদরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকৃতিতে এক মনোরম স্নিগ্ধ ছবি একে দেয়। আবার সূর্য্য যখন অস্তাচলগামী হয় তখন দৃষ্টির অন্তরালে যাবার আগে আগে পানিতে লাল গোলাপি আবীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে যেন পানিতে ডুবতে থাকে। প্রকৃতির সে এক অপরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যা সহজেই উজিরপুর সংলগ্ন সড়ক থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে দৃষ্টিগোচর হয়। সৃষ্টির এই আবছা আলো আধারের খেলায় তখন দূরে কোথাও পানসী অথবা ঘাস কাটা নৌকার মাঝির দরাজ গলার গান মনে অপরিসীম প্রশান্তি এনে দেয়। মন হয়ে উঠে ভাবুক। উজিরপুরের পূর্বদিকেও আছে আরও একটি বিশাল বিস্তৃত হাওর। এর নাম ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওর। জনশ্রুতি আছে এক সময় এই হাওরে ঘুঙ্গিয়া (বড় ট্যাংরা/গোলশা) মাছের আধিক্য ছিল তাই এই নামাকরণ। হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ এবং বাহুবল এই তিন উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে

ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরের বিস্তৃতি। হাওরটি এক সময় তরফ রাজ্য/পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সৈয়দদের দ্বারা তরফ বিজিত হলে এর মালিকানা বংশানুক্রমে তরফের বিভিন্ন সৈয়দ পরিবারের কাছে চলে যায়। কাল পরিক্রমায় সৈয়দ পরিবারগুলো দুর্বল হয়ে পরলে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এই হাওরের অনেকাংশের মালিকানা আশেপাশের ভূস্বামী পরিবারগুলোতে চলে যায়। নজিরউদ্দিন সাহেবের পরিবারের এই হাওরে অনেক ভূসম্পত্তি থাকার কারণে তিন থানা সদরেই যোগাযোগ রাখতে হয়।

উজিরপুরের পূর্ব পাশ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া শাখা বরাক নদীর ওপার থেকেই জমি ঢালু হতে হতে ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরে গিয়ে বিলীন হয়েছে। মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশাল এই হাওর। মাঝে মাঝে কোথাও বড় কোন গাছ অথবা বহু দূরে ক্ষীণ হয়ে আসা গ্রামগুলো দেখা গেলেও পূর্বদিকে মনে হবে দিনারপুরের পাহাড়ই যেন হাওরটিকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। চৌধুরীবাড়ীর বাংলা (বৈঠক) ঘর বা পুকুর ঘাট অথবা আশেপাশে অন্য কোথাও বসে হাওর আর পাহাড়ের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক এই দৃশ্য সহজেই উপভোগ করা যায়। সঙ্গে হুহু শব্দে বয়ে যাওয়া পুবাল হাওয়ার শীতল পরশ। গ্রীষ্মকালে যা খুবই আরাম এবং স্বস্তিদায়ক। সকালবেলা পুকুর ঘাটে বসে সূর্যোদয় অবলোকন খুবই মনোহর আর উপভোগ্য। বিশাল লাল সূর্য্য মনে হবে যেন আস্তে আস্তে অদূরে পাহাড়ের বুক চিড়ে বেড়িয়ে আসছে। বর্ষাকালে বেলা বাড়ার সাথে সাথে হাওরের পানি আর ঢেউয়ে বিচ্ছুরিত সূর্য্য কিরণ কখনো রুপালী আবার কখনো সোনালী আলোর খেলায় মেতে উঠবে। রঙের সেই অপূর্ব খেলায় দেখা যাবে কোথাও যাত্রী নিয়ে পানসী আবার কোথাও ঘাস বা ফসল নিয়ে ডিঙ্গি নৌকা হাওর পাড়ি দিয়ে এদিক ওদিক ছুটে চলেছে। সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ পাহাড়ের চূড়া থেকে উঁকি দিয়ে পূর্ব দিগন্তে বাদামী হলুদ আলো ছড়াতে ছড়াতে উঠতে থাকে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে এই চন্দ্রালোক রুপালি আলোর বন্যায় চারিদিক ভরিয়ে দেয়। তখন আবছা স্নিগ্ধ আলোয় হাওরের মাছ ধরার জেলে নৌকাগুলো কালো কালো ছায়ার মত অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। সকাল সন্ধ্যা দিবাকর আর চাঁদের প্রকৃতিতে সৃষ্ট এই অপূর্ব মনোহর দৃশ্যাবলী আমাদের গ্রাম বাংলার চিরায়ত অতি সুন্দর রুপ। আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। আমাদের দেশ প্রেমের আধার। আবার শুষ্ক মওসুমে যখন হাওর বাওরে পানি থাকেনা তখন দিগন্ত জুড়ে ফসলী মাঠে থাকে শুধুই গাড় সবুজের সমারোহ। মৃদুমন্দ বাতাসে ফসলের বাড়ন্ত ধান গাছে খেলে যাওয়া ঢেউয়ের আরেক মনোরম দৃশ্য। এর মধ্যে দিয়ে একেবেঁকে চলে গেছে আঞ্চলিক মহাসড়ক অথবা অন্য কোন গ্রামীণ সড়ক। গ্রাম বাংলার চিরায়ত অপূর্ব এক নান্দনিক রুপ। কিছুদিনের ব্যবধানেই গাড় সবুজ রং পরিবর্তিত হয়ে সোনালী ধানে মাঠ ভরে যায়। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধানের সময়ে এবং চৈত্র বৈশাখে বোরো ফসলের মওসুমে। কৃষকের বুক ভরে

যায় আনন্দে আর মন হয়ে উঠে ফুরফুরে। অকাল বন্যায় বেরো ফসলের হানি না হলে স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যায় পুরোটা বছর। ধান আর মাছ প্রকৃতির এই অফুরন্ত দানের কারণে উক্ত এলাকার মানুষের মনও খুবই উদার।

ধর্ম শিক্ষা দিয়ে লেখাপড়ার শুরু

নজিরউদ্দিন সাহেবের পিতা-মাতা দুজনেই ধার্মিক ছিলেন। এজন্য সব সময়েই বাড়ীতে একটি ধর্মীয় ভাব গম্ভীর আবহ বিরাজমান ছিল। যার ফলে বাড়ীতে ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান যথারীতি নিয়মমাফিক পরিপালিত হত। বড়রা নামাজ রোজা নিয়মিত আদায় করতেন এবং কনিষ্ঠরা তাদের অনুগামী হতেন। তাই বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়েই বড় হয়েছেন। সময়মত নামাজ আদায় এবং রোজা সহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই বাল্যকাল থেকেই নিয়মিত পালন করতেন এবং আমৃত্যু এই নিয়ম তিনি লালন করে গেছেন। শৈশবে লেখাপড়ার হাতেখড়ি বাড়ীতে এবং গ্রামের মসজিদের মক্তবে আরবী ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিয়ে শুরু হয়। অল্প বয়সেই তিনি আরবী হরফের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথমে কায়দা-সিপারা সহ আরবী হরফের বিভিন্ন ব্যবহার তিনি শেখেন। শুধু মক্তবের মৌলভী সাহেব নন বাড়ীতেও মা বাবা সহ অন্যান্য মুরুব্বীদের কাছ থেকেও তিনি আরবী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন। আল্লাহ্র রহমতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ পড়া শিখে ফেলেন। পবিত্র কোরআন করিম পড়া ও শিখা সাবলীল হয়ে আসলে কোরআনের কয়েকটি সূরাও আত্মস্থ করে ফেলেন।

স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহন

আরবী ও ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁকে পাশের গ্রাম সাদকপুরের পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি বাংলা ইংরেজি বর্ণমালা সহ গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা নামতার সাথে পরিচিত হন। বছর কয়েক পড়াশুনার পর কৃতিত্বের সাথে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করেন। এই পাঠশালা নিয়ে তিনি প্রবল আবেগ ও গর্ববোধ করতেন যা পরবর্তীতে লক্ষ্য করা গেছে। সেই সময়ে শিক্ষকদের, তিনি যতই নিম্ন ক্লাসের শিক্ষক হন না কেন পরিবারের মুরুব্বীদের মতই শ্রদ্ধা ও মান্যগণ্য করা হত। তিনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেক শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। একবার উজিরপুর যাওয়ার পথে উনার এক বয়োবৃদ্ধ শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত হয়। লেখক সঙ্গে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন। এই বিদ্যালয় আজও বর্ধিত কলেবরে বিদ্যমান আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি খেলাধূলায়ও আগ্রহী ছিলেন। বাড়ীর সামনে পূর্ব দিকে প্রায় তিনশত গজ দূরে উজিরপুরের বারেরায় উনার পূর্বপুরুষদের পরিত্যক্ত বসতবাটি ততদিনে ঘাস জমে মাঠের মত হয়ে গিয়েছিল। ওখানে গ্রামের সবাই খেলাধুলা করত। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সমবয়সীদের সাথে

তিনিও ফুটবল, হাডু-ডুডু এবং অন্যান্য গ্রামীণ খেলায় মেতে উঠতেন। ফুটবল খেলা এক সময় উনার অতি প্রিয় খেলায় পরিণত হয় এবং এই খেলায় অনেক পারদর্শী হয়েও উঠেছিলেন।

মাদ্রাসা শিক্ষাগ্রহণ ও ফুটবল খেলায় অনুরাগ

পাঠশালার পাঠ শেষে পারিবারিক সিদ্ধান্তে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উনাকে হবিগঞ্জ শহরতলীর উমেদনগর মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। ওখানে কিছুকাল অধ্যয়ন করার পর তিনি হবিগঞ্জের অন্তর্গত বাহুবল থানা সদরে অবস্থিত বাহুবল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। বছর কয়েক বাহুবল মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষে তিনি সিলেটে আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখনকার মত মাদ্রাসা বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তখন পর্যাপ্ত ছাত্রাবাস ছিল না। তাই মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি পরিচিত বিভিন্ন বাড়ীতে লজিং থেকেছেন। লজিং থাকা মানে নিজের পড়াশুনার পাশাপাশি গৃহকর্তার সন্তানদের গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে তাদের পড়ালেখায় সাহায্য সহযোগিতা করা। মাদ্রাসায় পড়লেও ফুটবল খেলার প্রতি প্রবল ঝোঁক তখনও ছিল তাই তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতেন। সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার মাঠটি বেশ বড়সড় হওয়ার কারনে খেলাধুলা চর্চার ভাল সুযোগ ছিল। এক সময় মাদ্রাসা ফুটবল টিমের একজন সেরা খেলোয়াড় হিসাবে উনার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফুটবল টিম নিয়ে বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফুলবাড়ি সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতা খেলতে গিয়েছেন। এই খেলায় তিনি অনেক মেডেল এবং ট্রফি জিতেছেন যেগুলো গ্রামের বাড়ীতে সংরক্ষিত ছিল।

ছোটবেলা মাদ্রাসায় পড়ার একপর্যায়ে তিনি গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কলেরা ও বসন্ত রোগ তখন গ্রাম বাংলায় মহামারী আকারে দেখা দিত এবং এতে বহু লোকের প্রানহানি সহ অঙ্গহানি হত। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমাদের দেশ থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে এবং কলেরার অনেক উন্নত চিকিৎসা উদ্ভাবনের কারনে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। এই রোগে তিনি অনেকদিন ভুগেছেন। অবশেষে মায়ের অক্লান্ত সেবা, মুরুব্বীদের দোয়া এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে কোন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি বা অঙ্গহানি ছাড়াই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তবে উনার মুখমণ্ডলের বসন্ত রোগের দাগ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী ও অনুপ্রেরণার উৎস

মাদ্রাসায় পড়লেও তিনি কখনো পেশাদার মৌলভী কিংবা মোল্লা হতে চাননি। তখন সর্বত্রই মুসলমান তরুণ এবং এদের পূর্বসূরিরা শিক্ষিত হয়ে কেউ উকিল, কেউবা শিক্ষক আবার কেউ কেউ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন। এদের কারনে তাঁদের পরিবারেরও নামডাক ছড়িয়ে পরছিল। বিশেষকরে পাশের গ্রাম খাগাউরার খানবাহাদুর দেওয়ান আজিজুর রহমান চৌধুরী ওরফে আখল মিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,

হবিগঞ্জ সদরের দরিয়াপুরের ভাতৃত্রয় আব্দুর রব চৌধুরী সরকারী কলেজের প্রফেসর, আব্দুস সালাম চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আব্দুস সোবহান চৌধুরী উকিল, মাধবপুর উপজেলার পিয়াইমের আলাউদ্দিন চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরী উকিল, নবীগঞ্জ উপজেলার সুনাইত্তা পরগণার কসবা গ্রামের খানবাহাদুর আব্দুল হাই চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সুনাইত্তা পরগণার মস্তফাপুর গ্রামের ভাতৃদ্বয় নজমুল হোসেন চৌধুরী শিক্ষা অফিসার, মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী উকিল, বানিয়াচঙের রশিদুল হাসান সাহেব মুন্সেফ এবং সুজাত পুরের এহিয়া খান চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউন্দার আব্দুর রহিম চৌধুরী উকিল ও পি,পি এবং নবীগঞ্জ থানার দিনারপুর পরগনার আতানগিরির দেওয়ান আব্দুল মতিন চৌধুরী উকিল হলে তাদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এত শুধু তৎকালীন হবিগঞ্জ মহকুমার আংশিক চিত্র। এছাড়াও বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আরও অনেক অনেক নামজাদা ব্যক্তিত্ব আধুনিক এই শিক্ষা গ্রহণের আন্দোলনে ব্রতী হন এবং নিজের ও পরিবারের খ্যাতি ছড়িয়ে দেন।

সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় সহপাঠী এবং আত্মীয় নবীগঞ্জ থানার দূর্লভপুরের দেওয়ান মোহাম্মাদ আহমদ (গরছি দেওয়ান) সাহেব, বিয়ানীবাজার উপজেলার আজিজ আহমদ সাহেব এবং নজিরউদ্দিন সাহেব মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন মাদ্রাসার পড়ার পাশাপাশি মেট্রিক (এস, এস, সি) পরীক্ষারও প্রস্তুতি নিবেন। অনেক মাদ্রাসায় তখন আরবী ও ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলীম পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মাদ্রাসার পড়া এবং মেট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হলেও একসঙ্গে চালিয়ে নিতে তিনজনই সম্মত হলেন। কঠোর পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ অধ্যাবসায়ের কারণে যথাসময়ে দুই পরীক্ষাতেই তাঁরা তিনজনই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য দেওয়ান মোহাম্মদ আহমদ সাহেব পরে এম, সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়া পড়াশুনা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস, সি সমাপ্ত করে কলেজ শিক্ষকতায় যোগ দেন। আজিজ আহমদ সাহেবও এম, এ পাশ করে কলেজ শিক্ষকতায় যোগ দেন। উভয়ে অধ্যক্ষ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

সিলেট এম, সি, কলেজে অধ্যয়ন

নজিরউদ্দিন সাহেবের পিতা মাইনর পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছরের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা ও সহমর্মিতার কারনে হাই স্কুলের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েও মেট্রিক পরীক্ষা দেননি। তাই তাঁর অধুনিক শিক্ষা গ্রহণের এই সিদ্ধান্তে পরিবারের মুরুব্বিরা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আই, এ পড়ার জন্য সিলেট এম, সি কলেজে ভর্তি হন এবং পারিবারিক ভাবে পরিচিত দরগা মহল্লায় মুফতি বাড়ীর আত্মীয় এক বাড়ীতে উনার

লজিং থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। নজিরউদ্দিন সাহেব বাল্যকাল থেকেই ধার্মিক ছিলেন। নামাজ রোজা কখনো তরক করেননি। বেশভূষাও সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবি ও টুপিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময় এবং চাকুরী জীবনের শুরুতে চুড়িদার পায়জামা ও শেরওয়ানি মাঝেমাঝে পরিধান করতেন। তাই অধুনিক শিক্ষার ব্রত নিয়ে কলেজে পড়লেও কাপড় চোপড়ে কোন পরিবর্তন আনেন নি। তিনি কখনো সম্পূর্ণ দাড়ি শেভ করেননি।

লজিং বাড়ীতে ছাত্র পড়াতে হয়। উনার ছাত্রের আবার পড়াশুনায় মনোযোগ কম ছিল। একবার এমন হল রাতভর ছাত্রটিকে একটি অঙ্ক কষিয়ে পরের দিন সকালে ঐ অঙ্ক কষতে দিলে সে বিফল হয়। এভাবে রাত জেগে জেগে তাকে পড়িয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পরতেন আর এতে উনার নিজের লেখাপড়াতেও বিঘ্ন হতে লাগল। অবশেষে পরিবারের পক্ষ থেকে সিলেটে তাকে থাকার জন্য বাসা ভাঁড়া করে দেয়া হলে স্বস্তি আসে এবং তিনি নিজের পড়াশুনায় মনোযোগ দেন। ফুটবল খেলার ঝুঁক এম, সি কলেজে পড়ার সময়ও ছিল এবং তখনো বিভিন্ন এলাকায় ফুটবল খেলতে যেতেন। এম, সি কলেজে পড়ার সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম ছাত্র সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে মুসলিম লীগের বিভিন্ন সভা সমিতিতে দলবল সহ যোগ দিতেন। এম, সি কলেজে উনার ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন বিয়ানীবাজারের জনাব জালাল উদ্দিন চৌধুরী, জনাব আব্দুল মুমিত চৌধুরী, সিলেট সদরের জনাব আবু সালমান ফয়েজুল ইসলাম চৌধুরী এবং সিলেট মুফতী বাড়ীর জনাব সরকুম এনায়েতউল্লাহ সাহেব। প্রথমোক্ত তিনজন বি, এ পাশ করে আইন শাস্ত্রে এল, এল, বি করেন এবং জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে এই সার্ভিসের উচ্চ পদে আসীন হয়ে তারা অবসরে যান। সরকুম এনায়েতুল্লাহ সাহেব চীফ কেমিস্ট হিসাবে বি, সি, আই, সি থেকে অবসর গ্রহন করেন। তিনি চাকুরী জীবনের প্রথমদিকে সুনামগঞ্জেও কিছুদিন চাকুরী করেন।

সহপাঠী জালালউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের কন্যা শবনম চৌধুরীর সাথে নজিরউদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে ডাঃ মোঃ হিফজুর রহমান চৌধুরীর বিয়ে হয়। বেয়াই হওয়ার সুবাদে পরবর্তীতে দুজনের হৃদ্যতা আরো নিবিড় হয়। দেখা সাক্ষাতে দুজনেই ছাত্র জীবনের সোনালি স্মৃতি নিয়ে একান্তে আলোচনা করতেন। বি, এ পড়ার সময় নজিরউদ্দিন সাহেব ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের এস, আই (দারোগা) পদে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মনোনয়ন পান। নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই মন থেকে সাড়া না পেয়ে এবং উনার এক শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের পরামর্শে পুলিশের চাকুরীতে পরে আর যোগ দেননি। চার বছর সিলেট এম, সি কলেজে অধ্যয়ন শেষে কৃতিত্বের সাথে বি, এ পাশ করেন।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও রাজনীতি

তখনকার সময়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল সত্যিকার অর্থে গুরু-শিষ্যের মত। শিক্ষকগণ সততা, নিষ্ঠা ও উচ্চ আদর্শ সম্বলিত মানবিক গুণাবলীর প্রতীক ছিলেন। ছাত্রদের সন্তান তুল্য মনে করতেন। সব সময় ছাত্রদের সৎপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতেন। শুধু পড়াশুনা নয় ছাত্ররা যাতে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই জন্য সর্বান্তকরণে সহায়তা ও সহযোগিতা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের মেধার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তাদের নিয়ে গর্ববোধ করতেন। এম, সি কলেজে অধ্যয়নের সময় তেমনি এক প্রজ্ঞাবান শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রায়শই এক মেধাবী ছাত্রের প্রশংসা করতেন। শিক্ষক মহোদয় উক্ত মেধাবী ছাত্রের ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছিলেন। উত্তর পত্রের প্রতিটি পাতায় ছাত্রটি তার লেখনিতে প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিলেন। শিক্ষক মহোদয় ছাত্রটির মেধায় এতটাই মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছিলেন যে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন শেষে প্রতি পাতায় লিখে দিয়েছিলেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষক থেকে শ্রেয় (একজামিনী ইজ বেটার দেন একজামিনার)। ছাত্র এবং শিক্ষক দুজনেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কতটা মহান এবং ন্যায়নিষ্ঠ হলে একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানবান এই বাক্যটি পরীক্ষার খাতায় লিখে দিতে পারেন যখন ধর্মের প্রভাব বলয়ের কারণে সমাজ এবং রাষ্ট্র বিভক্ত হতে চলেছে। সেই বিখ্যাত ছাত্রটি আর কেউ নন। বাংলাদেশের হুমায়ূন কবীর সাহেব। যিনি পরবর্তীতে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে গেছেন। ছাত্ররাও শিক্ষকদের পিতামাতার ন্যায় সম্মান করতেন। দেখা সাক্ষাতে শিক্ষকদের কদমবুচি অথবা পায়ের ধুলো নিতেন। এই ধারা আমাদের সমাজে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

পক্ষান্তরে আজকাল আমরা কি দেখতে পাই। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক যেন স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ। দুপক্ষের ক্ষমতা-শ্রয়ী রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রায়ই ছাত্রদের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির খবর পাওয়া যায়। পাকিস্তানি যূগে আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের হাত ধরে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে পটু ছাত্র রাজনীতির যে অশুভ ধারার সূচনা করা হয়েছিল সেই ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনৈতিক লেজুড়-বৃত্তিক সংস্কৃতি এখন শত সহস্র সর্পিল ডাল পালা মেলে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তবে তখনকার সরকার সমর্থক মুষ্টিমেয় ছাত্রের সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন নিজেদের প্রভাব বলয় সৃষ্টি এবং সরকার বিরোধী কোন অসন্তোষ যাতে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে দানা বাধতে না পারে সেই লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে রাখত। এখনকার মত টেন্ডার বাজি এবং আর্থিক সুবিধা অসুবিধার যাঁতাকলে জড়িয়ে পড়ত না। এখন শিক্ষকরাও অনেক ক্ষেত্রে পদ পদবীর লালসায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পরছেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকরাই একাজে লিপ্ত হন। এজন্যই সর্বস্তরের শিক্ষাঙ্গনে আজ এদের জয়জয়কার লক্ষ্য করা যায়। মেধার সাথে রাজনীতির এই নীতি হীন আপোষের

কারণে হয়ত আমাদেরকে ভবিষ্যতে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। এক শ্রেণীর ছাত্ররাও এই অনৈতিক আপোষের ফায়দা লুটে নিচ্ছে। কোন কারণে স্বার্থের ব্যত্যয় হলে তারা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত অপদস্থ করতে পিছপা হয় না। অহরহ এরকম ঘটনা খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন সহায় হন। আমাদের শিক্ষাঙ্গনের অতীত ঐতিহ্য যেন সত্বর ফিরে আসে।

উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকা গমন

নজিরউদ্দিন সাহেব কলেজ শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। পরিবারের মুরুব্বীদের সাথে এনিয়ে পরামর্শ করলেন। কলেজ শিক্ষক হতে হলে এম, এ পাশ করতে হবে। তিনি ছোটবেলা থেকেই খুবই ধার্মিক ছিলেন। নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে আরো অধিকতর জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা উনার সব সময় ছিল। কোরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে হলে আরবী ভাষা জানা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের অনেক গবেষণা ও তথ্যবহুল বই পুস্তক আরবীর পাশাপাশি ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে। এ-দুটো ভাষাও এম, এ তে আরবীর সহায়ক ভাষা হিসাবে পড়ানো হয়। সার্বিক বিবেচনায় তিনি আরবী সাহিত্যে এম, এ পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ততদিনে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং এর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা যাতায়াত সময় সাপেক্ষ হলেও আগের মত আর কষ্টসাধ্য নয়। ঢাকার সঙ্গে সিলেটের ইতিমধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে এবং ঢাকা যাতায়াত অনেকটাই সহজতর হয়ে গিয়েছে। মা-বাবা এবং বড়দের দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যে এম, এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন।

ব্রিটিশ আমলে শহর হিসাবে ঢাকার আয়তন ছিল খুবই ছোট। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে তিন চার কিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পুরাতন ঢাকার পরিধি। সদরঘাট, ইসলামপুর, চকবাজার, নারিন্দা, ওয়ারী, লালবাগ সহ পুরাতন আরো কিছু কিছু জনবসতি পূর্ণ এলাকা নিয়ে তখনকার ঢাকার বিস্তৃতি ছিল। ঢাকা শহরকে বিদেশীরা তখন কিছু কিছু নাগরিক সুবিধাদি সহ বড় আকারের গ্রামই মনে করত। রাতে রাস্তায় রাস্তায় বিজলী বাতির ব্যবস্থা খুব কম জায়গাতেই ছিল। রাতের ঢাকা শহরে তখন কুকুরের ঘেউঘেউ আর শিয়াল সহ বিভিন্ন বন্য প্রানীর হাঁকডাক বাসিন্দাদের ভয়ার্ত করে রাখত। বর্তমান ঢাকা শহরের ঝলমলে বর্ধিত কলেবরের সঙ্গে এর কোন মিল খোজে পাওয়া যাবে না। রাস্তাঘাট ছিল খুবই সরু সরু এবং অপর্যাপ্ত। তারপরেও বর্তমানের মত শহরবাসীকে যানজটের কবলে পড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নাকাল হতে হত না। তখন পাবলিক যানবাহন বলতে কিছু ছিল না। ঢাকার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই পদব্রজে চলাফেরা করতেন। কেউ কেউ অবশ্য সাইকেল অথবা ঘোড়ার গাড়ীর বাহন টমটমেও চলাফেরা করতেন। সামান্য কিছু মোটরযান হয়ত বড় কোন জমিদার বা ব্রিটিশ

ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন নয়ত কোন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সেবায় তখন ঢাকার রাস্তায় মাঝেমধ্যে নজর কাড়ত।

বর্তমান ঢাকা এবং নাগরিক অস্বস্তি

পুরনো ঢাকার তুলনায় বর্তমান ঢাকার কলেবর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনবহুল ও আয়তনে ছোট আমাদের এই বাংলাদেশের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু এখন রাজধানী ঢাকা। পৃথিবীর জনবহুল রাজধানী শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা অন্যতম। পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, নাগরিক দায়-দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা বোধে ঘাটতি এবং সর্বোপরি আইন প্রয়োগে শিথিলতা এসব মিলিয়ে ঢাকা এখন অ-বসবাসযোগ্য শহরগুলোর একটি। রাস্তায় বেড়োলেই শুধু গাড়ী আর গাড়ী। গাড়ীর দীর্ঘ লাইন আর এর জন্য সৃষ্ট যানজট। পনের মিনিটের রাস্তা যেতে লাগে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা। রাস্তা ভর্তি বিভিন্ন মডেলের বিচিত্র আকৃতি প্রকৃতির সব যানবাহন। চালকেরা কেউ কোন নিয়ম কানুনের ধার ধারেনা। কোন কিছুরই তোয়াক্কা তাঁরা করছে না। যার থাকার কথা ডানের লেনে সে থাকছে বাঁয়ে। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে লেন পরিবর্তন করে কার আগে কে যাবে সেই নিয়ে চলছে নিরন্তর এক অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতা। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গগনবিদারী কান ফাটানো হর্নের ব্যবহার। এই অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখার যেন কেউ নেই। সভ্য এবং সচেতন নাগরিকদের এখন ঢাকা শহরে চলাফেরা করা নিতান্তই পীড়াদায়ক। এত গেল ট্রাফিক অব্যবস্থাপনার দিক।

আজকাল ঢাকার অনেক অভিজাত এলাকায় দৃষ্টি নন্দন টাইলস দিয়ে নাগরিকদের হাঁটাচলার জন্য ফুটপাত তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নাগরিকের কি নির্বিঘ্নে হাটচলা করতে পারছেন। কোন কোন জায়গায় দেখা যাবে হকার চা, কলা, বিস্কিট বিক্রয়ের ডালা নিয়ে ফুটপাথে বসেছে। কোথাও কোথাও আবার হকার চুলা ও নোংরা টেবিল সাজিয়ে চা তৈরির নানা সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। হকারকে ঘিরে অনেক লোকজন জটলা করে এটা ওটা খাচ্ছে আর খাবারের সব বর্জ্য রাস্তাতেই ফেলছে। পথচারী কোন দিক দিয়ে হাঁটবে বা যাবে সেই দিকে ক্রেতা বিক্রেতা কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে যেন কর্তৃপক্ষই সুন্দর সুন্দর টাইলস লাগিয়ে প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে যাতে হকাররা ব্যবসা করতে পারে। বিশ্বের কোথাও এরকম অপচয় বোধহয় দেখা যাবে না। আবার কোথাও হয়ত দেখা যাবে বড় সাহেবদের বাড়ীর সামনের ফুটপাতে দামী গাড়ী দাড় করিয়ে চালক নল লাগিয়ে ইচ্ছামত পানি দিয়ে গাড়ী পরিষ্কার করছে। নোংরা পানিতে চারিদিক সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ধৌতকারীর কোন দিকেই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। রাস্তা দিয়ে পথচারী চলছে এতে যেন তার কিছুই যায় আসে না। এর সাথে যোগ হবে প্রতি নিয়ত নুতন নুতন বহুতল ভবন তৈরির নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় ফেলে রাখার প্রবণতা। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা দখল করে ভবনের বিভিন্ন কাজও করে চলেছেন নির্মাণ শ্রমিকেরা। দিন নেই রাত নেই সারাক্ষণ কাজ করে চলেছে তাঁরা। যদিও রাতে এধরণের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু কে শুনে কার নির্দেশ।

যানবাহনের শব্দ সহ নানা ধরণের শব্দের কারণে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ। অনিয়ম আর অরাজকতায় নাগরিক জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। কিন্তু দেখার কেউ নেই।

নজিরউদ্দিন সাহেব ছাত্র জীবনে বছর দুয়েক ঢাকা শহরে কাটালেও পরে কর্মজীবনে এই শহরে খুব একটা আসা হয়নি। হয়ত তিন চার বছরে একবার সীমিত সময়ের জন্য কোন জরুরী কাজে এসেছেন। অবশ্য অবসরের পর যতদিন শরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে তাবলীগের বিশ্ব এজতেমায় যোগ দিতে নিয়মিত হাজির থাকতেন। তাই হয়ত ঢাকার এলোমেলো শ্রীবৃদ্ধি চোখে পড়েনি। বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মধ্যে ঢাকায় ছেলেমেয়েদের বাসায় অনেক দিন এসে থেকেছেন। তখন নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া আসা অথবা কোথাও বেড়াতে গেলে ঢাকা শহরের পাল্লা দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ ও জায়গায় জায়গায় ফেলে রাখা আবর্জনার স্তূপ উনার নজরে এসেছে। এনিয়ে অনেক সময় ঘরোয়া আলোচনায় ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। বলতেন অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন বাংলাদেশের যত অসচেতন, অর্ধ-সচেতন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষগুলো ঢাকা শহরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র স্মরণে এই হলের নামাকরন। বর্তমানে এই হল মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু স্যার সলিমুল্লাহ হল নামে পরিচিত। ঢাকার নবাবদের দানকৃত জমিতে বিশাল বিশাল এলাকা জুরে আবাসিক হল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। হেটে শেষ করা যায় না। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় পরবর্তীতে নবাব আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা বর্তমানে বুয়েট নামে পরিচিত সেটিও ঢাকার শিক্ষানুরাগী নবাবদের দান করা জমিতে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয় ইমারত এবং আবাসিক হলগুলো খুবই দৃষ্টিনন্দন। ইমারত গুলোর স্থাপনা শৈলী তখনকার সময়ে প্রচলিত মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগল স্থাপত্যের আদলে গঠিত ইট সুরকির বড় বড় দালান। চারিদিকে বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ গাছালিতে ভরে আছে ক্যাম্পাস ও হলগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা। আলো বাতাসে ভরপুর অপূর্ব এক ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ ও বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে একেকটি হল দেখলে চোখ জুরিয়ে যায়। মন ভরে যায়।

নজিরউদ্দিন সাহেব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন উপমহাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলন তুঙ্গে। ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন এই উপমহাদেশ বহু ভাষাভাষী বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এবং বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নানা জাতি উপজাতি গুষ্ঠির আবাসস্থল ছিল। শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় পরিচয় ব্যতীত এদের মধ্যে অমিলই ছিল বেশি। তবে ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার বিচারে তারা মূলত হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই দুই ধর্মের অনুসারীরা অনেক ক্ষেত্রেই

একই ভাষাভাষী এবং অভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। একই সমাজে বাস করেও তারা ধর্মাশ্রয়ী দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে অভ্যস্ত ছিল। ধর্মীয় সংকীর্ণতাই এর মুখ্য কারণ ছিল। তাই তাদের মধ্যে কোন সামাজিক মেলবন্ধন ও দায়বদ্ধতা গড়ে উঠেনি। ফলে একই সমাজে বাস করেও তারা একে অপরের সেই অর্থে অপরিচিতই ছিল।

তাদের এই বিভক্তি ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় আস্তে আস্তে আরো ব্যাপক এবং প্রকট হতে থকে। হিন্দুরা ইংরেজ সরকারে আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়। যার ফলে তারা অর্থ-বিত্তে ও সচ্ছলতায় এবং আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের থেকে অনেক ভাল অবস্থানে নিজেদের উন্নীত করতে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ ভারতে তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়া বর্ণ হিন্দুরা লেখাপড়া ব্যবসা বাণিজ্য সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধায় অনেক বেশী এগিয়ে ছিল। মুসলমানদের তুলনায় জমিদার জোতদার ও মহাজন যেমন বেশির ভাগই হিন্দু ছিল তেমনি প্রজা সাধারণ হিসাবে কোথাও কোথাও মুসলমানদেরই আধিক্য ছিল। প্রজাকূল মধ্যসত্ব ভোগী উভয় সম্প্রদায় দ্বারা নিগৃহীত হলেও মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত ধারণা ছিল শুধুমাত্র হিন্দু জমিদার জোতদার মহাজনরাই প্রজা শোষণের জন্য দায়ী। জমিদার জোতদার এবং মহাজনদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার বিচারে এটা অনেকাংশে সত্য ছিল।

সিলেটের মুসলমানদের অবস্থান পূর্ববাংলার অন্য সব এলাকার তুলনায় অনেকটা ভাল ছিল। তারপরেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্ব বিষয়ে এগিয়ে ছিল। যদিও নজিরউদ্দিন সাহেব যে ধরনের পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন সেখানে হিন্দুদের দ্বারা নিগৃহিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই ছিল। তারপরেও এই আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পরা অবস্থান থেকে উত্তরণের লক্ষ্কেই নজিরউদ্দিন সাহেবের মত অনেক শিক্ষিত তরুণরা তখনকার সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনীতির সঙ্গে নীতিগতভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ঢাকা মুসলিম লীগের সূতিকাগার হওয়ার কারনে আন্দোলন সংগ্রাম আরো তীব্র। প্রায়ই মিটিং-মিছিল হচ্ছে। মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্র সমাজের কর্মীরা পাকিস্তান হাসিলের জন্য সোচ্চার এবং বদ্ধপরিকর। তিনিও তখনকার সময়ে আরো দশজন শিক্ষিত মুসলমান তরুণের মত এই আন্দোলন সংগ্রামের নৈতিক সমর্থক ছিলেন এবং সকল সভা সমাবেশে যোগ দিতেন। তখনকার রাজনীতি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অহিংস ছিল। পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররা অনায়াসে পছন্দের রাজনীতির কর্মী সমর্থক হতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যে এম, এ পড়ার সময় নজিরউদ্দিন সাহেবের সহপাঠী ছিলেন জামালপুরের জনাব এম, এ, কুদ্দুছ সাহেব। আরবীতে পড়লেও তিনি কেতাদুরস্ত সাহেবিয়ানা পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি এম, এ তে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হন। কুদ্দুছ সাহেব পরবর্তীতে কিছুদিনের জন্য সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ

নজিরউদ্দিন সাহেব ১৯৩৯ -৪১ সনের সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে এবার বাড়ী ফেরার পালা। দুটি বছর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় আর অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল। হবিগঞ্জে এসে পরিচালনা কমিটির আহ্বানে এম, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত হবিগঞ্জ হাই স্কুলে কিছুদিন খণ্ড কালীন শিক্ষকতা করেন। তখনকার সময়ে হবিগঞ্জ হাই স্কুলের উনার কয়েকজন ছাত্র যারা পরবর্তীতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন, তাদের মধ্যে শাহ এ, এম, এস কিবরিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী, প্রফেসর এম, এ খালেক স্বনামধন্য বিলেত থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত লে: কর্নেল সৈয়দ আব্দুল হান্নান উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন সম্পর্কে উনার ভাগিনেয় ছিলেন।

কিছু দিনের ব্যবধানে এম, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। সময়টা ছিল ১৯৪১ সাল। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেন। অল্পের জন্য প্রথম শ্রেণী হাতছাড়া হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার জন্য নিজের একটি অসতর্কতামূলক ত্রুটিকে দায়ী মনে করতেন। আর ভুলটি হয়েছিল পরীক্ষার রুটিন সংগ্রহের সময়। আরবীতে ফাইনাল পরীক্ষা কয়েক পত্রে হয়। একদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখেন উনি যে পত্র চিন্তা করে পড়াশুনা/রিভিশন এবং প্রস্তুতি নিয়েছেন প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন পত্র ভিত্তিক। প্রস্তুতি কম থাকায় উক্ত পত্রে পরীক্ষা কাঙ্ক্ষিত হয়নি। যার ফলে অল্প নাম্বারের জন্য প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তি হতে তিনি বঞ্চিত হন। তারপরেও পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর গুজার হলেন এবং পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন। বানিয়াচং থানায় অনেকেই শিক্ষিত আছেন এবং উনার পূর্বে বি, এ পাশ করেছেন তবে সম্ভবত তিনিই প্রথম মুসলিম এম, এ ডিগ্রী ধারী ছিলেন। এম, এ পাশ করায় হিন্দু মুসলমান অনেকেই বাড়ীতে উনাকে দেখতে আসতেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ

এম, এ পাশ করলেও চাকুরী পাওয়া তখন অতটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। চাকুরী স্বল্পতা বিশেষ করে সরকারী ক্ষেত্রে এর প্রধান কারণ ছিল। কিছুদিন প্রতীক্ষার পর অবশেষে আসাম সরকারের সচিবালয়ে একটা চাকুরী পেলেন। কর্মস্থল আসামের তখনকার রাজধানী শিলং শহর। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর শৈল শহর শিলং। আবহাওয়া ভাল এবং বছরের অধিকাংশ সময় তাপমাত্রা ঠাণ্ডা থাকে। সিলেট শহর থেকে খুব একটা দূরে নয়। বর্তমান সিলেট ও ভারতের মেঘালয় সীমান্ত থেকে আঁকা বাঁকা এবং কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ব্রিটিশ ভারতে বৃহত্তর সিলেট আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এবং শিলং আসামের রাজধানী হওয়ায় সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু শিলং সবাইকে যেতে হত। স্যার সৈয়দ সাদ-উল্লাহ’র নেতৃত্বাধীন আসাম প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী সভায় তখন সিলেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য ছিলেন। সুনামগঞ্জের মুনাওওর

আলী সাহেব, হবিগঞ্জের মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী সাহেব, সিলেট সদরের আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব সহ অনেকেই উক্ত মন্ত্রী সভার দাপুটে সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দফতরেও কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবেও সিলেট বাসীর প্রাধান্য ছিল। সরকারের সিভিল সার্ভিসে অনেক পদস্থ ব্যক্তিত্ব সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। এজন্য শিলং তখন সিলেট বাসীর কাছে খুবই একটি গ্রহণযোগ্য ও সহজে যাতায়াত যোগ্য একটি শহর ছিল। শিলং সচিবালয়ের চাকুরী নজিরউদ্দিন সাহেবের মন মত হচ্ছিল না। উনার ইচ্ছা কলেজ শিক্ষকতায় যোগ দেয়া। সরকারী কলেজে যোগ দিতে হলে এম, এ তে প্রথম শ্রেণী দরকার সাথে আবার সুপারিশেরও প্রয়োজন। যাদের খুঁটী বেশি শক্ত যেমন কোন বিশিষ্ট জনের আত্মীয় অথবা জামাতা দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়েও কেউ কেউ সরকারী কলেজে চাকুরী পেয়ে গেলেন। সিলেটের সকল মহকুমা শহরে তখনো কলেজ স্থাপিত হয়নি। বৃহত্তর সিলেটে শুধু সিলেট সদরে এম, সি কলেজ অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছিল এবং মহকুমা শহর গুলোর মধ্যে একমাত্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ কয়েক বছর হয়েছে যাত্রা শুরু করেছে। তাই নতুন কলেজ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত শিলং এর চাকুরীতে মনোনিবেশ করলেন।

সুনামগঞ্জ কলেজের যাত্রা শুরু

অবশেষে উনার প্রতীক্ষার পালা শেষ হল। ১৯৪৪ সালে সুনামগঞ্জ শহরের শিক্ষানুরাগী বেশ কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তির উদ্যোগে সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলেজ স্থাপনায় সেই সময়ে সুনামগঞ্জের অনেক নাম না জানা বিত্তশালী ও উদ্যোগী মহতী লোকজন অংশ নিয়েছিলেন। তখনকার আসাম প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী সুনামগঞ্জের কীর্তিমান পুরুষ জনাব মুনাওওর আলী সাহেব এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এই দুঃসাধ্য কাজটি সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল।

কলা অনুষদের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কলেজের পাঠ্য কার্যক্রম শুরু হয়। ইংরেজি, বাংলার পাশাপাশি সাহিত্য বিষয় হিসাবে আরবী ভাষায় পদ খোলা হলে নজিরউদ্দিন সাহেব আরবীর প্রফেসর হিসাবে মনোনয়ন পেলেন। তখনকার দিনে কলেজ শিক্ষকদের এত পদ ও পদবীর বিন্যাস ছিল না। আজকাল যেমন প্রথমে প্রভাষক এবং পরে পদোন্নতি পেয়ে ক্রমান্বয়ে সহকারী / সহযোগী অথবা অধ্যাপক হয়ে চাকুরীর মেয়াদ শেষে অবসর নেন। তখন কলেজ শিক্ষকতায় এত স্তর বিন্যাস ছিল না। কলেজ শিক্ষক মানেই প্রফেসর শুধু নবীন আর প্রবীণ এবং প্রবীণ হয়ে একসময় অবসরে যেতেন।

বৈচিত্র্যময় নৈসর্গিক রূপের আধার সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ নামাকরন নিয়ে যতটুকু জানা যায় সুনামদি (সুনাম উদ্দিন নামের আঞ্চলিক রূপ) নামক জনৈক

মোগল সৈন্য সুরমা নদীর তীরে বসতি গড়ে তুলেন। পরে এই বসতিকে ঘিরে যে জনপদ ও বাজার বা গঞ্জ গড়ে উঠে তাই কাল পরিক্রমায় সুনামগঞ্জ নামে পরিচিতি পায়। হাওর বাওর বেষ্টিত ভাটি অঞ্চল সুনামগঞ্জ নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে ভরপুর। সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী উত্তর প্রান্তে খাসিয়া জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড়ের উপস্থিতি প্রাকৃতিক এই শোভাকে আরো বহুগুণ বর্ধন করেছে। বর্ষাকালে সুনামগঞ্জ যেন পানিতে ডুবে থাকে। শুধুই অথৈ পানি আর পানি। একেকটা হাওর তখন সাগরে পরিণত হয়। সিলেট থেকে সড়ক পথে সুনামগঞ্জ যেতে যেতে তখন খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় আর অগাধ জলরাশির অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। যতই সুনামগঞ্জের কাছাকাছি যাওয়া যাবে ততই এই নৈসর্গিক শোভা মূর্ত হতে থাকে। একেক সময় মনে হবে এই বিশাল জলাধার আর অপূর্ব সুন্দর গাঁঢ় সবুজ পাহাড়ের মাঝে বুঝিবা কোন জনপদ নেই। আবার শুষ্ক মওসুমে দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ পর্যায়ক্রমে ভরে থাকে ঘন সবুজ আর সোনালী ধান গাছে।

সুনামগঞ্জের এই রূপ বোধহয় দরদী কবি মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, নাড়া দেয়। তাইত এত এত আউল বাউল আর মরমী কবিদের জন্ম হয়েছে সুনামগঞ্জের মাটিতে। হাওরের মাছ আর ফসলের সমারোহের কারনে সুনামগঞ্জের অধিবাসীদের বেশির ভাগ তাই ততটা হত দারিদ্র নয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ফসল হানি হলে তখন কৃষকের আর দুর্দশার অন্ত থাকে না। শিক্ষা দীক্ষায় বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য এলাকার তুলনায় সুনামগঞ্জ অনেকটাই পিছিয়ে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে আউল বাউল ও লোকগীতিতে সুনামগঞ্জ বাসীর অবদান চোখে পড়ার মত। অনেক কৃতি সন্তান যেমন রাধারমণ দত্ত, হাছন রাজা এবং সৈয়দ শাহনুরের মত প্রতিথযশা লোক-গীতিকারদের এখানে জন্ম হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন আমলের একেবারে শেষ সময়ে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সিলেটে আসা যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল নদীপথে ষ্টীমার অথবা লঞ্চ। এরপরে পাকিস্তান আমলেও বর্ষাকালে অনেকদিন পর্যন্ত সড়কের বেহাল দশার কারণে নদীপথে চলাচল অনেকটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

সুনামগঞ্জ শহর সিলেট থেকে পশ্চিম দিকে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। উত্তর দিক থেকে বাঁক নিয়ে শহরের কূল ঘেঁষে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সুরমা নদী প্রবাহিত হয়েছে। অদূরে উত্তরদিকে গ্রামগুলোর উপর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ঘন সবুজ খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়। বাঁকে দাঁড়ালে মনে হবে ঐ পাহাড়ের ঝর্ণা থেকেই বুঝি সুরমা নদী জন্ম নিয়ে কূল কূল বেগে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জ শহরকে বিধৌত করে বয়ে চলে গেছে। অপরূপ এই প্রাকৃতিক দৃশ্য মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সুনামগঞ্জ শহরের এক অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা এনে দেয়। সুনামগঞ্জে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টিপাত অনেক সময় মাসাধিক কাল পর্যন্ত চলে। বৃষ্টির পানিতে খাল বিল নদী নালা পুকুর সব কানায় কানায় ভরে যায়। শহরের অনেক এলাকার রাস্তা ঘাট

তখন পানিতে ডুবে যেত। গল গল করে প্রবল বেগে পানি খাল ও নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাটিতে থাকা নদী অথবা হাওরে গিয়ে পরতে থাকে। তবে এখন শহরের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। খাল, নালা সব ভরাট করে নুতন নুতন বাড়িঘর নির্মাণের কারনে অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে যায়। কিছু কিছু এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। তখন নাগরিক ভোগান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। কর্তৃপক্ষের উচিত হবে অবস্থা আরা খারাপ হওয়ার আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আগে বর্ষাকালে শহরের চারিদিকে শুধু পানি আর পানি চোখে পড়ত। প্রকৃতির ওই অশান্ত সময়ে কুলা ব্যাঙের হাঁকডাক আর সাপ কেঁচোর মধ্যে জলাবদ্ধ মানুষের তখন একেবারেই বেহাল অবস্থা। তবে মৎস্য শিকারিদের জন্য সময়টা ছিল খুবই মোক্ষম। কেউ জাল দিয়ে আবার কেউবা কোঁচা/জাটা দিয়ে মাছ শিকার করে চলেছে। রাতের বেলাও থেমে নেই শিকারিরা। টর্চের আলোয় চলছে মাছ শিকার। সুনামগঞ্জে এমনিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে তখন সর্বত্রই মাছ আর মাছ। এমনকি রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময়ও দেখা যেত আশেপাশের নালা থেকে লাফ দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রাস্তায় এসে পড়ছে। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা যা সত্যিই উপভোগ্য।

মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা

সুনামগঞ্জ শহর সংলগ্ন লক্ষণশ্রী পরগণার তেঘরিয়ায় বহুল পরিচিত এবং কিছুটা সমালোচিত মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার জন্মস্থান। তিনি এই এলাকার প্রতাপশালী জমিদারও ছিলেন। সমালোচিত এই জন্যে যে তিনি নারী সংসর্গ পছন্দ করতেন। তাঁর অনেক পত্নী ও উপপত্নী ছিল। তাঁর এ সংক্রান্ত অনেক কেচ্ছা কাহিনী সুনামগঞ্জ শহরের লোক মুখে এখনো শুনা যায়। হাছন রাজার দৌহিত্র অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব তাঁর লিখিত গ্রন্থেও এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বৃহত্তর সিলেটে হাছন রাজার সমসাময়িক ছোট বড় অনেক জমিদার ছিলেন। সুনামগঞ্জ মহকুমায়ও অনেক প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। কাল পরিক্রমায় সবাই এক সময় বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে গেছেন। এমনকি সুনামগঞ্জ শহরের প্রতিথযশা রাজনীতিবিদ ও ব্রিটিশ আমলের মন্ত্রী, সুনামগঞ্জের অনেক উন্নয়নের পথিকৃৎ সর্ব-জনাব মুনাওওর আলী সাহেবকেও আজ খুব কম সংখ্যক লোকই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মরমী কবি হাছন রাজা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। প্রায় শতাব্দী আগে পরলোকগমন করলেও এখনো তিনি মানুষের মনে চির জাগরুক চির ভাস্বর। তাঁর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া মরমী গীত সমাহার সর্ব স্তরের বাঙালী মনকে আকৃষ্ট করে আন্দোলিত করে। তাই হাছন রাজার পরিচিতি এখন আর সুনামগঞ্জ, বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই বাঙালী সংস্কৃতি-মনা মানুষ আছেন সেখানেই তিনি আদৃত ও সমাদৃত। সুনামগঞ্জে হাছন রাজার মেলার আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে তাঁর রচিত গানের চর্চা করা হয় এবং তাকে স্মরণ করা হয়।

সুনামগঞ্জে তাঁর উত্তরপুরুষগণও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে হাছন রাজাকে জনগণের আরো কাছাকাছি নিতে এবং তাঁর সম্বন্ধে সবাইকে আরো ভালভাবে জানাতে সচেষ্ট আছেন। হাছন রাজা সৌভাগ্যের বরপুত্রও ছিলেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল সিলেট সদর মহকুমার বিশ্বনাথ থানার রামপাশা গ্রামে। পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী রামপাশার জমিদার ছিলেন। লক্ষণশ্রীর জমিদার ওয়েজউদ্দিন চৌধুরী শিশু সন্তানদের নিয়ে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করলে তদীয় বিধবা স্ত্রী লক্ষনশ্রীর বিশাল সম্পত্তির ওয়ারিশ হন। পরবর্তীতে দেওয়ান আলী রাজা উচ্চ বংশীয়া উক্ত বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। আলী রাজার ঔরসে এই স্ত্রীর একমাত্র সন্তান ছিলেন দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী। ওয়েজউদ্দিন চৌধুরীর পরিবারের সমূদয় সম্পত্তি মায়ের একমাত্র পুত্র হিসাবে দেওয়ান হাছন রাজা ওয়ারিশ হন। অপরদিকে রামপাশায় পিতা জীবিত অবস্থায় একমাত্র বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যু হয়। হাছন রাজা তখন সবেমাত্র যুবক। ভাইয়ের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে পিতা আলী রাজাও পরলোকগমন করলে হাছন রাজা এই দুই এলাকার জমিদারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। হাছন রাজা ভাবুক প্রকৃতির হলেও এবং আমোদ ফুর্তিতে সময় কাটালেও খুবই বিচক্ষণ ও বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। হাছন রাজার এই গুণ তাঁর পুত্র এবং পৌত্রগণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সাংসারিক এই বিচক্ষণতার কারণে হাছন রাজার পরিবারের অধিকাংশ উত্তরপুরুষগণ এখনো সচ্ছল অবস্থায় আছেন। হাছন রাজা কঠোর হস্তে জমিদারী পরিচালনা করেছেন এবং সহায় সম্পত্তি আরো অধিক বিস্তৃত করেছেন। উত্তরপুরুষগণ অনেকে এখনো জীবন জীবিকার জন্য তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে আছেন। লক্ষণীয় হাছন রাজার উত্তরপুরুষগণের এত অধিক হারে বিস্তৃতি এবং সবার মোটামুটি সচ্ছল অবস্থান যা বৃহত্তর সিলেটের অন্য কোন ভূস্বামী পরিবারে বিরল। এটা নিঃসন্দেহে কোন আল্লাহ্ ভক্ত মহান ওলি-আল্লাহ্‌র দোয়ার বরকতের ফল। এই পরিবারের প্রতি মহান আল্লাহ-তায়ালার নিয়ামত। বৃহত্তর সিলেটের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারই এই পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। হাছন রাজা দয়ালু ও পরোপকারীও ছিলেন। প্রজাদের অনুকূলে অনেক দান খয়রাত করে গেছেন। সুনামগঞ্জ শহরের বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তিনি এবং তার উত্তরপুরুষগণ অনেকেই নিজেদের জমি জিরাত দান করে গেছেন। নজিরউদ্দিন সাহেব যখন সুনামগঞ্জ কলেজে যোগদান করেন তখন হাছন রাজার ছেলেদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ দেওয়ান আফতাবুর রাজা সাহেব জীবিত ছিলেন। সুনামগঞ্জ কলেজের বর্তমান নান্দনিক ক্যাম্পাস দেওয়ান আফতাবুর রাজার দানকৃত জমিতে অবস্থিত।

আলিমাবাগের ঐতিহ্যবাহী আলী পরিবার

নজিরউদ্দিন সাহেব কলেজে যোগ দিতে যাবেন কিন্তু সুনামগঞ্জ শহরে চেনাজানা তেমন কেউ নেই। তবে শহরের আলিমাবাগের আলী ব্রাদার্সদের তখন খুব নামডাক। স্বনামধন্য এই আলী পরিবারের আদি নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সড়াইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে। উক্ত পরিবারের আদি পুরুষ মৌলভী মোশাররফ আলী সাহেব

আইন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। ভাগ্য উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন জায়গায় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সাংস্কৃতিমনা ছিলেন এবং গান বাজনা করতে ভালবাসতেন। এক পর্যায়ে তিনি পূর্বপরিচিত সুনামগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের অনুরোধে সুনামগঞ্জ শহরে এসে আইন পেশা শুরু করেন এবং এখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। আইন পেশায় উনার প্রভূত পশার লাভ হয়। সুনামগঞ্জ শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় নিজ বসতবাটি স্থাপন করেন। কালক্রমে উনার উত্তরপুরুষদের আবাসস্থল এই এলাকা আলিমাবাগ নামে পরিচিত হয়। মোশাররফ আলী সাহেবের তিন ছেলে মৌলভী মুজাহিদ আলী, মৌলভী মুনাওওর আলী এবং মৌলভী মসদ্দর আলী ব্রিটিশ আমলে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। নিঃসন্দেহে বৃহত্তর সিলেটে একই পরিবারের তিনজন স্নাতক তখনকার সময়ের একটি বিরল দৃষ্টান্ত। সুনামগঞ্জ-ত বটেই সম্ভবত বৃহত্তর সিলেটেও উনাদের পূর্বে খুব কম সংখ্যক পরিবারের লোকজনই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। প্রথমোক্ত দুইজন আলীগড় থেকে এল, এল, বি সমাপ্ত করে আইন পেশায় যুক্ত ছিলেন। মসদ্দর আলী সাহেব আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

মৌলভী মুনাওওর আলী সাহেব এক সময়ের সুনামগঞ্জ শহরের নামজাদা উকিল ছিলেন। সুনামগঞ্জ পৌরসভারও একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে তিনি রাজনীতিতেও জড়িত হন। আসাম আইন সভার সদস্য এবং স্যার সাদ-উল্লাহ মন্ত্রী সভার তিনবারের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি এলাকার উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছিলেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই সুনামগঞ্জ কলেজ ও সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। তিনি পরোপকারীও ছিলেন। এলাকার গরীব মেধাবী ছাত্রদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহায়তা করতেন। সুনামগঞ্জে তখন কোন আবাসিক হোটেল ছিল না। চাকরী সুত্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা লোকজনের পরিচিত কারো বাড়ীতে অথবা মেসে নিজ নিজ আবাসন তৈরি করে নিতে হত। সেই সময়ে নূতন কেউ শহরে এলে মুনাওওর আলী সাহেবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহনের সুযোগ ছিল।

বীর গাঁওয়ের উকিল সাহেব ও তদীয় পত্নী

সুনামগঞ্জের আরো একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক জনাব রফিকুল বারী চৌধুরী (বীরগাঁওয়ের উকিল) সাহেব বাল্যকাল থেকেই নজিরউদ্দিন সাহেবের সুপরিচিত ছিলেন। আলীগড় থেকে এল, এল, বি সমাপ্ত করে সুনামগঞ্জ শহরে তিনি তখন আইন পেশা শুরু করেছেন। তিনি নজিরউদ্দিন সাহেবের বছর কয়েকের জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং আত্মীয়তার সুবাদে উনাকে চাচা সম্বোধন করতেন। বীরগাঁওয়ের জমিদার পরিবারের সন্তান। হবিগঞ্জে মামা মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী সাহেবের বাসায় থেকে স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী সাহেব

খুবই নামজাদা সম্ভবত ব্রিটিশ আমলে হবিগঞ্জের প্রথম ও একমাত্র মুসলমান বি, এ, এল, এল, বি উকিল ছিলেন। হবিগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। পরে তিনি বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আসাম আইন পরিষদের কয়েকবার সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্যার সাদুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন আসাম প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত হন। উপ-মহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হলে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। মোদাব্বির সাহেব এবং উনার আত্মীয়স্বজনদের সাথে উজিরপুরের চৌধুরীদের বিশেষকরে নজিরউদ্দিন সাহেবের চাচা ও বড় ভাইয়ের বেশ ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। পারিবারিকভাবে দুই পরিবারের বেশ যোগাযোগ ও যাতায়াত ছিল।

রফিকুল বারী সাহেব হবিগঞ্জে স্কুলে পড়ার সময় একবার প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বর কিছুতেই কমছিল না। তিনি বাড়ী (বীরগাঁও) যাওয়ার জন্য কাতর হয়ে পরলেন। বর্ষাকাল বিধায় উনার সঙ্গে নৌকায় সঙ্গী হওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। নজিরউদ্দিন সাহেব সেই কিশোর বয়সে নৌকায় রফিকুল বারী সাহেবর সঙ্গী হন এবং উনাকে বীরগাঁওয়ে পৌঁছে দেন। বীরগাঁওয়ে উষ্ণ আতিথ্য গ্রহণ শেষে পরের দিন তিনি একাই নৌকা নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন। মোদাব্বির সাহেব পরে ওকালতি পেশা ও বাসস্থান হবিগঞ্জ থেকে সিলেট শহরে স্থানান্তর করেন। সিলেটের ওই বাসায় নজিরউদ্দিন সাহেবের যাতায়াত ছিল। সেখানেও পরবর্তীতে মোদাব্বির সাহেবের ভাগিনেয়দের সাথে নজিরউদ্দিন সাহেবের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। আশা করলেন সুনামগঞ্জে এলে বীরগাঁওয়ের উকিল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা নেয়া যাবে।

রফিকুল বারী সাহেব খুবই সুদর্শন এবং সৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক এবং সদালাপী ছিলেন। সবসময় পরিপাটি থাকতেন। কোর্টে স্যুট টাই পড়ে কেতাদুরস্ত হয়ে যেতেন। গ্রামের বাড়ীতে প্রচুর সহায় সম্পত্তি ছিল। উকিল হিসাবেও উনার আয় রোজগার ভাল ছিল। শহরের হাছন নগর এলাকায় উন্নত রুচিকর মান সম্মত বসতবাটিতে থাকতেন। বাড়ীর সামনেই লনে খুব সুন্দর সাজানো গুছানো ফুলের বাগান ছিল। বিভিন্ন ধরনের ও প্রজাতির ফুলের গাছে ভরপুর ছিল বাগান। তিনি নিজে অনেক সময় ফুল গাছের পরিচর্যা করতেন। তখনকার সময়ে সুনামগঞ্জ শহরে যে কয়জন আধুনিক ও রুচিশীল জীবন যাপন করতেন তন্মধ্যে রফিকুল বারী সাহেবের পরিবার অন্যতম।

রফিকুল বারী সাহেবের সহধর্মিণী সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম রাবেয়া বারী চৌধুরী সুনামগঞ্জের নারী কল্যাণে নিবেদিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। নারীদের সংগঠন সুনামগঞ্জ মহিলা সমিতি উনার মত আর কয়েকজন বিদুষী মহিলা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুবই বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। সবার

সঙ্গে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারতেন। শহরের হিন্দু মুসলমান সব পরিবারের কাছেই উনার ঈর্ষনীয় গ্রহণ যোগ্যতা ছিল। শহরের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উনার অংশগ্রহণ প্রায় অপরিহার্য্য ছিল। তিনি ও সানন্দে সব জায়গাতেই যেতেন। এই মহীয়সী মহিলা এক অতি সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন। পিত্রালয় বিভাগ-পূর্ব আসামের করিমগঞ্জ মহকুমার দেওরাইল গ্রামে। বৃহত্তর সিলেটের অগ্রগণ্য একটি শিক্ষিত ভূস্বামী পরিবার। পিতা জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। ব্রিটিশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। মিসেস রাবেয়া বারী সুনামগঞ্জ নারীর শিক্ষায়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। রফিকুল বারী সাহেব এবং উনার স্ত্রী মিসেস রাবেয়া বারী আর জীবিত নেই। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন উনাদের দুজনকে বেহেশত নসীব করুন।

সুনামগঞ্জ কলেজে যোগদান

সেই সময়ে সুনামগঞ্জ যাতায়ত এখনকার মত এত সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত সিলেটের সাথে সুনামগঞ্জের কোন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এ নিয়ে আসাম পার্লামেন্টে তুখোড় বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জের কীর্তিমান পুরুষ মন্ত্রী জনাব মোনাওওর আলী সাহেব। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে সিলেটের সাথে সুনামগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যথাসময়ে কলেজে যোগ দিতে সিলেট থেকে নৌপথে ষ্টীমার যোগে সুনামগঞ্জ এলেন। সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক ব্যবস্থা তখন সবেমাত্র চালু হলেও যানবাহন ছিল অপ্রতুল। কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উনাকে গ্রহণ করলেন। নুতন কলেজ তাই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। কলেজের যোগদান ও পরিচয় পর্ব শেষে মুনাওওর আলী সাহেবের বাসভবনে গেলেন। উদ্দেশ্য থাকার বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই কিছুদিন অবস্থান করবেন। কিন্তু খবর পেয়ে ঐদিন সন্ধ্যায় সহপাঠী সরকুম এনায়েতউল্লাহ সাহেব এসে উনাকে মেসে নিয়ে গেলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন এবং পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকর গোজার হলেন। তিনি ব্যতীত কলেজের অন্যান্য শিক্ষকগণ সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। অধ্যক্ষ সাহেব খুবই অমায়িক এবং উন্নত মন মানসিকতার অধিকারী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব আপাদমস্তক ধার্মিক হলেও ধর্মান্ধ ছিলেন না। অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারতেন। তাই নতুন জায়গা এবং পরিবেশে উনার কোন সমস্যা হচ্ছিল না। কর্মক্ষেত্রে কলেজের সহকর্মী উনারা সবাই যেন একই পরিবারভুক্ত ছিলেন। কলেজ ক্যাম্পাস তখন শহরের কেন্দ্রস্থল মেইন পয়েন্টে (বর্তমান আলফাত চত্বর) কাঠ ও টিনের তৈরি একটি দুতলা বাড়ীতে অবস্থিত ছিল।

মফস্বল মহকুমা শহর সুনামগঞ্জ ও আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রীতি

পূর্ব-বাংলার এক প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক মহকুমা সুনামগঞ্জ। মহকুমা সদর, ছোট্ট শহর সুনামগঞ্জ নামেই পরিচিত। বর্তমানে এটি জেলা। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষকরে সড়ক পথে স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সিলেট থেকে আগে সড়ক পথে যেখানে পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় লাগত সেখানে এখন দেড় দুই ঘন্টায় সুনামগঞ্জ যাওয়া যায়। তবে সড়কটির মাঝেমধ্যেই বেহাল দশা হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ সময়মত রাস্তার সংস্কার করলে হয়ত সুনামগঞ্জ বাসীর কষ্ট অনেকটাই লাঘব হবে। ব্রিটিশ আমলে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও এর চারপাশের গ্রামগুলো ছিল মোটামুটি মুসলিম অধ্যুষিত। শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠ লক্ষনশ্রীতে দাপুটে মুসলমান জমিদার মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরীর বাড়ী। লক্ষণশ্রীর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এদের অনেকেই দাপুটে হলেও কখনো শহরের হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেন নি। তখনকার সময়ে শহরের খাবার-দাবারের দোকান সহ ও অন্যান্য সব ব্যাবসা বাণিজ্য ছিল মোটামুটি হিন্দু বণিক মহাজনদের হাতে।

সেই সময়ে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা মূলত বৈঠকখানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। উভয়ের মধ্যে একটা মানসিক দূরত্ব বজায় থাকত। এখনকার মত এত আন্তরিক এবং সাবলীল ছিল না। এখনত প্রতিটি উৎসব পার্বণ উদযাপনে উভয়ের সম্পর্ক একেবারে অন্দরমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কারণও ছিল। তখনকার সময়ে হিন্দুরা জাতপাত এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ে বেশ রক্ষণশীল মনো-ভাবাপন্ন ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও মুল্লাতান্ত্রিক প্রভাবের ফলে ধর্মীয় সংকীর্ণতার কোন কমতি ছিল না। তারপরেও উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন ছিল বাংলা ও আসামের চিত্র। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে মিলেমিশে থাকত। সুনামগঞ্জেও সুন্দর অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। কলেজে চাকুরীর সেই সময়ে কোন একদিন বিকেলে অধ্যক্ষ সাহেবের আমন্ত্রণে নজিরউদ্দিন সাহেব সহ কলেজের কয়েকজন প্রফেসর কলেজের বিপরীতে ডেইরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে চা পান করতে গেলেন। তখনকার দিনে হিন্দু মালিকানাধীন খাবার দোকানগুলোতে মুসলমানদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা ছিল। এই আলাদা বসার ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। তবে পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে হিন্দু মালিকানাধীন খাবার দোকানগুলোতে আলাদা বসার ব্যবস্থা একেবারেই উঠে যায়। অধ্যক্ষ সাহেব সবাইকে নিয়ে হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ম্যানেজার বাবু / মালিক নজিরউদ্দিন সাহেবের ব্যাপারে অধ্যক্ষের কাছে আপত্তি জানালেন। উত্তরে অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁকে বললেন তিনি আমাদের সম্মানিত প্রফেসর এবং একজন অতিথি। তিনি যে কোন স্থানে বসতে পারেন। ম্যানেজার বাবু মুখ ভার করে আর কোন কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। অধ্যক্ষের ওই মন্তব্য নজিরউদ্দিন সাহেবকে অভিভূত করেছিল। তিনি

প্রায়ই তখনকার ওই অধ্যক্ষ মহোদয়ের আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ শিষ্টাচার ও উন্নত অসাম্প্রদায়িক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

ব্রিটিশ আমলে সুনামগঞ্জ শহরে তখন গুটিকতক মাত্র মুসলিম পরিবারের বাস। আলীমাবাগের মৌলভী মুনাওওর আলী সাহেবের পরিবার, ষোলঘরে জনাব আবু হানিফা আহমদ নওয়াব মিয়া সাহেবের পরিবার এবং ষোলঘরের পীরবাড়ীর পরিবারগুলো টিমটিম করে শহরে মুসলমানদের অস্তিত্ত জানান দিচ্ছিল। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর হিন্দুরা দলে দলে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমাতে শুরু করলে শহরে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। পাঞ্জেগানা এবং জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য শহরে তখন উল্লেখযোগ্য কোন জামে মসজিদ ছিল না। যার যার মহল্লায় মুসল্লিরা স্থানীয়ভাবে নির্মিত মসজিদে নামাজ আদায় করতেন। তবে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। শহরে পুরাতন কোর্ট প্রাঙ্গণ সংলগ্ন টাউন মসজিদটি নির্মাণের প্রথম উদ্যোগটি নেন সেসময়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবিগঞ্জের কৃতি সন্তান জনাব আলাউদ্দিন চৌধুরী সাহেব। পরে বরেন্যে সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের বড় ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেব ও প্রশাসনের অন্যান্য অধিকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই মসজিদটির কাজ সমাপ্ত হয়। আরও পরে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সহ অন্যান্য এলাকায় বেশ কয়েকটি মসজিদ স্থাপিত হয়। তখন শহরে বিজলী বাতি ছিল না। সন্ধ্যার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসত চারিদিকে। পাকিস্তান আমলে পৌরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন সড়কে ও মোড়ে কেরাসিন দিয়ে লন্ঠন বাতি জ্বালানো হত। তবে এগুলো প্রায়ই নষ্ট থাকত।

পাকিস্তান আমলেও সুনামগঞ্জ শহরে হিন্দু অধিবাসীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন। শহরে সন্ধ্যা নামত হিন্দু বাড়ীর উলু ধ্বনি আর শাঁখা ঘন্টির আওয়াজের পাশাপাশি মসজিদ থেকে মাগরিবের আজানের মধ্য দিয়ে। হিন্দু মুসলমান দুপক্ষই আড়ম্বরের সাথে তাদের ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ পালন করতেন। এনিয়ে কোথাও কোন বচসা ও গোলযোগের খবর পাওয়া যায় নি। নজিরউদ্দিন সাহেব সুনামগঞ্জে তাঁর সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে অনেক হিন্দু উকিল, মোক্তার, সরকারী চাকুরে ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে মেলামেশা করেছেন। অনেকেই উনার সুহৃদ ও বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। সংক্রান্তি কিংবা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু পরিচিতজনদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। সুনামগঞ্জে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিভূ খ্রিষ্টান মিশন উনার প্রতিবেশী অবস্থানে ছিল। তাঁদের সকলের সঙ্গে উনার সুসম্পর্ক ছিল এবং এদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের আমন্ত্রণেও যোগ দিতেন। কলেজের গরীব কিন্তু মেধাবী অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীকে সাহায্যের জন্য সম্মানীর বিনিময়ে উনার সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করতেও দেখা গেছে।

ষোলঘরের নওয়াব মিয়া সাহেব

পাকিস্তান আমলে সুনামগঞ্জের শহরের ষোলঘর নিবাসী আবু হানিফা আহমেদ নওয়াব মিয়া সাহেব খুবই প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেবের সাথে নওয়াব মিয়া সাহেবের খুবই আন্তরিক ও হৃদ্যতা-পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তখনকার আমলে সুনামগঞ্জ কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যও ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ আমলে সুনামগঞ্জে আলীমাবাগের আলী ভাইদের খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি যখন আকাশচুম্বী তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে উনাদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠি এবং নিকটাত্মীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকের মত নওয়াব মিয়া সাহেবের পিতা জনাব ফয়েজ আলী মিয়াও ভাগ্যোন্নয়নে সুনামগঞ্জ শহরে স্থানান্তরিত হন। আলী ভাইদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ফয়েজ আলী সাহেব লেখাপড়া জানা বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। অচিরেই তিনি প্রভূত সহায় সম্পত্তির অধিকারী হন। কথিত আছে উনার হাতি এবং অনেকগুলো ঘোড়াও ছিল। শহরের উপকন্ঠে সুরমা নদীর কূল ঘেঁষে ষোলঘরে অনেকটা জায়গা নিয়ে মনোরম পরিবেশে উনার বসতবাড়ি। তিনি রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে সুনামগঞ্জ শহরের অনেক ছোটখাটো সভা সমাবেশ উনার বাড়ীতে হত এবং তখনকার সময়ের অনেক প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ফয়েজ আলী সাহেবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ মুনাওওর আলী সাহেবকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু সুনামগঞ্জ এলে ফয়েজ আলী সাহেবের বাড়ীতেই সভা করেছিলেন এবং ওই বাড়ীতেই অতিথি হয়েছিলেন।

পিতার রেখে যাওয়া সচ্ছল অবস্থার কারণে নওয়াব মিয়া সাহেবকে আর আয় রোজগারের জন্য সরকারী অথবা বেসরকারি চাকুরী খুঁজতে হয়নি। তাই বি, এ পাশ করেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েন। পিতার অনুসৃত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও উদ্যমে তিনি খুব শীঘ্রই নিজেকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেন। যতদিন রাজনীতি করেছেন সর্বসাধারণের কল্যাণ করার চেষ্টা করেছেন। কারো কোন ক্ষতি উনার দ্বারা হয়েছে এমন কখনো শুনা যায়নি। পাকিস্তান আমলে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। সুনামগঞ্জ পৌরসভার দীর্ঘদিন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। বেশ লম্বা চওড়া হৃষ্টপুষ্ট শ্যামলা এবং আকর্ষণীয় চেহারার নওয়াব মিয়া সাহেব বেশ হাসিখুশি ও আমোদে লোক ছিলেন। মাঝেমধ্যে নজিরউদ্দিন সাহেবের বাসায় আসতেন। দুজনে মিলে অনেকক্ষণ চা নাস্তা খেতে খেতে গল্পগুজব করতেন। আবার কখনো হয়ত কোন কাজে নজিরউদ্দিন সাহেবের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন কাছাকাছি এসে উনাকে ডাকাডাকি শুরু করতেন। সেই সময় রাস্তা ও বাসার মধ্যবর্তী স্থানে পৌরসভার প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ ফুট চওড়া খাল ছিল। নজিরউদ্দিন সাহেবও বাসায় থাকলে তাড়াতাড়ি বেড় হয়ে আসতেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর কিছুক্ষণ দুজনে মিলে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন। সেদিন আর অনুরোধ করলেও বাসায় আসতেন না। অনেকের মত একাত্তর সালে তিনিও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়

দিতে পারেন নি। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি অটল থেকেছেন। তিনি যাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় রাজনীতিতে সফলতা পেয়েছিলেন সেই ভোটার তথা বাঙালীর মনের খবর ধরতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে উনার মত জনপ্রিয় নেতারাও আজ বিস্মিত প্রায়। স্বাধীনতা অব্যবহিত পরবর্তী ডামাডোলের সময় কিছু অতি উৎসাহী উগ্রপন্থী নওয়াব মিয়া সাহেবকে নাজেহাল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে ও কিছু সুবুদ্ধি সম্পন্ন নেতাদের হস্তক্ষেপে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পান। শেষ বয়সে হয়ত তিনি ভুল রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি একজন সৎ এবং ভাল মানুষ ছিলেন। ভালকে ভাল বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

পূর্ব পরিচিত আবুল হাসান মাস্টার সাহেব

সুনামগঞ্জ শহরের ষোলঘরে মেসে থেকে নজিরউদ্দিন সাহেব আস্তে আস্তে শহরের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছেন। আত্মীয় বন্ধু পরিক্রমার মধ্যে বাল্যকাল থেকে পরিচিত এবং আত্মীয় আবুল হাসান সাহেবের সঙ্গে নজিরউদ্দিন সাহেবের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। আবুল হাসান সাহেবের বাড়ী ছাতক থানার মল্লিকপুর গ্রামে আর মাতুলালয় হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় সুনাইত্তা পরগণার মুস্তফাপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে। সেই সুবাদে নজিরউদ্দিন সাহবের পরিবার উনার পূর্ব পরিচিত। তিনি নজিরউদ্দিন সাহেবের বড় ভাইয়ের সমসাময়িক। তিনি সিলেট এম, সি, কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রখিতযশা কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী, সিলেট বারের নামজাদা উকিল সয়ফুল আলম খান এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের জ্ঞাতি চাচা বজলুর রহমান চৌধুরী এম, সি, কলেজে উনার সহপাঠী ছিলেন। আবুল হাসান সাহেব সুনামগঞ্জ গভর্নমেন্ট জুবিলী হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি খুবই অমায়িক ও সজ্জন লোক ছিলেন। উনার সহধর্মিনীও আত্মীয় হওয়ার সুবাদে নজিরউদ্দিন সাহেবের পরিবারের সাথে পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠতা আর গভীর হয়।

সাতচল্লিশের দেশ ভাগ এবং সিলেটের গনভোট

নজিরউদ্দিন সাহেবের সুনামগঞ্জ কলেজের চাকুরীর প্রথমদিকের সময়টা ছিল ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম সময়। সবাই ধরে নিয়েছে ধর্মীয় অনুভূতির ভিত্তিতে উপমহাদেশ স্বাধীন ও ভাগ হবে। দুটো দেশ হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারত ও মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পাকিস্থানের অভ্যুদয় ঘটবে। উষ্ণ রাজনীতির কারণে সর্বত্র সভা মিছিল সবসময় লেগেই আছে। সবার মনে উৎকন্ঠা কিভাবে দেশ ভাগ হয়। বৃহত্তর সিলেটের অন্তর্ভুক্তি ভারত না পাকিস্তানের সাথে হবে এনিয়ে মতানৈক্য চলছে। অবশেষে গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়। গণভোটের ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মোতাবেক সিলেট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত অথবা মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে। পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম লীগ এবং ভারতের পক্ষে কংগ্রেস নিজেদের পাল্লা ভারী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচার

প্রচারণা চালাচ্ছে। প্রচারণা জোরদার করার জন্য জিন্নাহ সাহেবকে ১৯৪৬ সালে সিলেটে আনা হয়। নজিরউদ্দিন সাহেব কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে জিন্নাহ সাহেবকে দেখার জন্য এবং তার বক্তব্য শুনার জন্য সিলেটে গেলেন। সিলেট শহরের ঈদগাহ ময়দানে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। জিন্নাহ সাহেব যথারীতি ইংরেজিতে সিলেটের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। সভাস্থল আনন্দে খুশিতে মুহূর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ল। গ্রীষ্মকাল বিধায় বাইরের আবহাওয়াও প্রচণ্ড গরম তাই সভাস্থল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বক্তব্যের পর জিন্নাহ সাহেব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। হবিগঞ্জের আব্দুল বারী মোক্তার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কিছু একটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটা বোধগম্য না হওয়ায় জিন্নাহ সাহেব তাকে তেজস্বী স্বরে হোয়াট বলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন আর এতেই জনাব আব্দুল বারী সাহেব মূর্ছা গেলেন। কেউ বলল ধমক খেয়ে আবার কেউবা বলল প্রচণ্ড গরমে তিনি মূর্ছা গেছেন। আব্দুল বারী সাহেব পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী নজিরউদ্দিন সাহেবের শ্বশুরবাড়ি দরিয়াপুর সংলগ্ন শরিফাবাদ গ্রামে।

সভা শেষে নজিরউদ্দিন সাহেবের মত অনেকেই এক বুক আশা নিয়ে ফিরেছিলেন হয়ত বৃহত্তর সিলেট পুরোটাই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু সে আশার গুড়ে-বালি। কিছুদিন পরেই তা প্রতিভাত হয়। অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রতীক্ষার পালা শেষ হল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিল। চারিদিকে স্বাধীনতা লাভের আনন্দের উদযাপন হচ্ছে। কিন্তু বিভাগ-পূর্ব সিলেটের ভাগ্য তখনো নির্ধারিত হয়নি। অবশেষে কিছুদিনের ব্যবধানে গণভোটের ফলাফল পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে থাকলেও সিলেটের কিয়দংশ কেটে ভারত (আসাম) এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এতে সিলটবাসীরা বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন । ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায় উভয়েরই যার যার অবস্থান অনুযায়ী বিভক্ত সিলেটের কারণে দুঃখ থেকেই গেল। করিমগঞ্জ এবং শিলচর এলাকাকে ভারতের সাথে যুক্ত করা হল এবং বাকী বৃহত্তর অংশ সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ মহকুমাগুলো পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

সংসার জীবনে প্রবেশ এবং শ্বশুরকূলের পরিচয়

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস আরো একটি কারনে নজিরউদ্দিন সাহেবের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ওই সময়েই তিনি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার দরিয়াপুর সাহেববাড়ীর জমিদার জনাব সরওয়ার চৌধুরী (চাঁনমিয়া) সাহেবের প্রথমা কন্যা বেগম আতিকুন্নেছা চৌধুরী'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দরিয়াপুর চৌধুরী বাড়ীতে চাঁনমিয়া সাহেব সব চাইতে অধিকতর ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং তুলনামূলকভাবে বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। সাহেববাড়ীর সামনের

সীমানা থেকে উনার নিজস্ব জমির উপর দিয়ে পায়ে হেটে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ রেলপথ পর্যন্ত যাওয়া যেত। চাঁনমিয়া সাহেবের পিতা সর্ব-জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী (মনাইমিয়া) সাহেব একজন প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ মিরাসদার ছিলেন। তিনি খুবই সুদর্শন ছিলেন এবং তখনকার সময়ে হবিগঞ্জের অভিজাত মহলে একজন সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য গ্রাম্য সালিশ ও বিচার বৈঠকে উনার অংশ গ্রহণ প্রায় অপরিহার্য্য ছিল। সবাই উনার বুদ্ধিমত্তা ও বিচার বিবেচনার এতটাই প্রশংসা করত যে এলাকায় কথিত আছে মনাইমিয়া সাহেব একাই আখলের (বুদ্ধির) তিন পোয়ার (পঁচাত্তর ভাগ) অধিকারী আর বাকী সবাই মিলে এক পোয়া (পঁচিশ ভাগ)।

মনাই মিয়া সাহেব ভ্রমন করা পছন্দ করতেন। প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের বাড়ীতে অবকাশ সময়ে বেড়াতে যেতেন। এমনকি একসঙ্গে বিদ্যমান চার সহধর্মিণীকে নিয়ে তিনি দিল্লী ও আগ্রায় তাজমহল পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন। উনার প্রথম স্ত্রীর পিত্রালয় ছিল দরিয়াপুর সংলগ্ন নছরতপুর সাহেববাড়ীতে, দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন আউশপারা দেওয়ান বাড়ীর, তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন উনার মাতুলালয়ের দিক থেকে আত্মীয়া সুনাইত্তা পরগণার কসবা চৌধুরী বাড়ীর। উল্লেখ্য মনাই মিয়া সাহেবের মাতুলালয় ছিল সুনাইত্তা পরগণার দীঘিরপাড় চৌধুরী বাড়ীতে। আর সর্বশেষ বা চতুর্থ বিয়েটি তিনি করেন শায়েস্তাগঞ্জ সংলগ্ন বিরামচর সাহেববাড়ীতে। উল্লেখ্য এই ভাগ্যবতী ও উচ্চ বংশজাত রমণীগণ একসঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আমৃত্যু উনার সঙ্গে সংসার করে গেছেন। মনাই মিয়া সাহেবের পৌত্রদের মধ্যে জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী সাহেব একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধিও ছিলেন। সুনামগঞ্জ গভর্নমেন্ট জুবিলী হাই স্কুল ও সুনামগঞ্জ কলেজে অধ্যয়ন করেছেন। সুনামগঞ্জে অধ্যয়ন কালে প্রথমে বাম রাজনীতি ও পরে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা হিসাবে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছে। তাঁর হাত ধরেই সুনামগঞ্জে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্য দুই স্বনামধন্য পৌত্র জনাব আব্দুল হেকিম চৌধুরী এবং মরহুম নোমান চৌধুরী হবিগঞ্জে সাংবাদিকতা পেশার পথিকৃৎ। প্রপৌত্র শোয়েব চৌধুরীও একজন প্রতিথযশা সাংবাদিক এবং হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি। মনাইমিয়া সাহেবের চাচাত ভাই আব্দুল কাদির চৌধুরী (শোওয়ামিয়া) সাহেব ব্রিটিশ আমলে পুলিশের আস, আই (দারোগা) হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে আবসর গ্রহণ করেন। উনার তিন ছেলে ব্রিটিশ আমলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করায় দরিয়াপুর চৌধুরী বাড়ীর খ্যাতি আরো বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

দরিয়াপুর এবং এর উচ্চ শিক্ষিত চৌধুরী পরিবারঃ

দরিয়াপুর শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে জংশন-স্টেশন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। দরিয়া শব্দের অর্থ নদী/বৃহৎ জলাধার। লোক মুখে শুনা যায় এই স্থানটিতে এক সময় বড়সড় একটি নদী ছিল। সেই থেকে নদী তীরবর্তী গ্রামটির নাম দরিয়াপুর। বর্তমানে নদীটির কোন অস্তিত্ব এই এলাকায় আর পাওয়া যায় না। হয়ত প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ের কারণে বিলীন অথবা সড়ে গিয়ে থাকতে পারে। উজান ভূমি হওয়ার কারনে দরিয়াপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল থেকেই উন্নত। কাছাকাছি রেল যোগাযোগের কারনে এলাকার লোকজন ঢাকা সিলেট সহ অন্যান্য জায়গায় সহজেই চলাচল করতে পারত। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও এখনকার মত যানবাহনের এত ছড়াছড়ি ছিল না। পায়ে হেটে অথবা ব্যক্তিগত যানবাহনে তখন চলতে হত। হাওর বাওর না থাকায় বর্ষাকালে এই এলাকায় পানির অপূর্ব শোভন দৃশ্য নজরে আসে না। বড় নদী খোয়াই এবং সুতাং সহ অন্যান্য সব ছোট ছোট নদীর উৎস ভারতের আসাম রাজ্যে। নদী গুলো থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট খাল, নালা বা পাহাড়ি ছড়া এসব এলাকায় পানির উৎস হিসাবে কাজ করে। উজানে অতি বর্ষণে অথবা বর্ষার ঢলে এইগুলো পানিতে কানায় কানায় ভরে যেত। কখনো কখনো দুকূল উপচে এই পানি পাশের ক্ষেত খামারে ঢুকে পড়ত। তবে তা কিছু সময়ের জন্য। আগে দু এক দিনের মধ্যেই পানি খাল অথবা ছড়া বেয়ে নেমে যেত। কিন্তু এখন পলি মাটিতে খাল ও ছড়াগুলো ভরাট এবং পানি নিষ্কাশনের জায়গায় নুতন নুতন বাড়ী ঘর ও স্থাপনা তৈরির কারণে অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা হয়ে যায়। হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নিকটবর্তী হওয়ার কারণে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন মিল কারখানা তৈরি হচ্ছে। প্রকৃতির সুন্দর সবুজ রূপ আস্তে আস্তে হাড়িয়ে যাচ্ছে। জমির মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে কৃষক আর কৃষি কাজে আগ্রহী নয়। জমি বিক্রি ও জমির দালালি করে অনেকের কাছেই এখন কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। এই এলাকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা না পরলেও সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘন কুয়াশার আড়ালে সবকিছু ঢাকা পড়ে যায়। এক হাত দূরের কোন কিছুই ভাল দেখা যায় না। ভোর হয়েছে হয়ত অনেক আগে কিন্তু সূর্য্যি মামার দেখা নেই। চারিদিকে গুমোট অন্ধকার। বেলা বেড়ে দিবাকর যখন প্রায় মধ্যা-কাশে তখন আস্তে আস্তে চারিদিক পরিষ্কার হতে শুরু করে। আবার প্রতিদিনের মত সন্ধ্যা নামর সাথে সাথে শুরু হয় ঘন কুয়াশার আবরণ। আবহাওয়াতে আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে হয়ত এই এলাকায় এত ঘন কুয়াশা হয়।

দরিয়াপুর গ্রামের খ্যাতি ও সর্ব মহলে পরিচিতির মূলে রয়েছে গ্রামের সম্ভ্রান্ত উচ্চ শিক্ষিত চৌধুরী পরিবার। চৌধুরীরা শুধু অভিজাত ভূস্বামীই ছিলেন না হবিগঞ্জ এবং বৃহত্তর সিলেটের অগ্রগণ্য মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত পরিবারগুলোরও অন্যতম। এই পরিবারের আদি পূর্বপুরুষ হিন্দু উচ্চ বর্ণের কায়েত মতান্তরে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাংলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে শায়েস্তাগঞ্জের অদূরে বরচর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশীয় উত্তরপুরুষ দুই ভাই ফার্সি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে সিলেট দেওয়ানী আদালতে কর্মরত ছিলেন। তখনকার সময়ে সিলেট যাতায়াতের জন্য সড়ক বা রেলপথ ছিল না। নৌপথে চলাচল সময় সাপেক্ষ হলেও স্বস্তি-দায়ক ছিল। সিলেট কর্মরত দুই ভাই ছুটিছাটায় নৌকা যোগে নদী তীরবর্তী দরিয়াপুর এলাকায় এসে অবতরণ করতেন। তারপর প্রায় মাইল খানেক দক্ষিণে নিজেদের বাড়ী বরচরে পদব্রজে গমন করতেন। যাতায়াতের সুবিধা এবং নতুন খরিদ কৃত জমিজমা ও মিরাস তদারকি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় তাঁরা বরচর থেকে পরবর্তীতে দরিয়াপুরে বসতবাটি স্থানান্তর করেন।

পূর্ব পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের এই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ আমলে এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হন। অনেকেই ব্রিটিশ এবং তৎ-পরবর্তী পাকিস্তান সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তখনকার সময়ে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ছুটিছাটায় গ্রামের বাড়ীতে আসতেন। একেত সম্পদশালী ভূস্বামী পরিবার সাথে সরকারের উচ্চ পদে আসীন সাহেব-সুবা হওয়ার কারনে চৌধুরীবাড়ী কালক্রমে সাহেববাড়ী হিসাবে পরিচিতি পায়। এক সময় এই পরিবারের সদস্যদের শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বেশ সমীহ করত সম্মানের চোখে দেখত। কোন কারণে স্টেশনে কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে যত্নআত্তি করত এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার চেষ্টা করত। হবিগঞ্জে সাধারণত পীর মুরিদির সাথে জড়িত সৈয়দ বংশীয় পীর সাহেবদের বাড়ী সাহেববাড়ী নামে অধিক পরিচিত। হবিগঞ্জে সৈয়দ বংশীয় অনেক ভূস্বামী পরিবারের গ্রামের বাড়ীও সাহেববাড়ী হিসাবে পরিচিত। এক্ষেত্রে দরিয়াপুরের সাহেববাড়ী এবং আরো দু-একটি শিক্ষিত চৌধুরী পরিবার ব্যতিক্রম।

দৃষ্টিনন্দন দরিয়াপুর সাহেববাড়ী

দরিয়াপুরের সাহেব বাড়ীটি একসময় খুবই সাজানো গুছানো ছিল। সেই জন্য ওই বাড়ীতে আগত মেহমান অতিথি অনেকেই মুগ্ধ হতেন এবং বাড়ীর সুন্দর পরিবেশের প্রশংসা করতেন। তখনকার সময়ে বৃহত্তর সিলেটে খুব কম সংখ্যক সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের গ্রামের বাড়ী এতটা সুরুচি-কর এবং দৃষ্টি-নন্দন ছিল। বেশ বড়সড় কয়েক একর জায়গা নিয়ে পুরো সাহেববাড়ীর সীমানা। তিন দিক খোলা। বাড়ীর সম্মুখভাগ পূর্ব দিক এবং দক্ষিণ দিকে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার দূরে অন্যান্য গ্রামগুলোর অবস্থান। তাই পুরো সাহেব বাড়ী এলাকা পর্যাপ্ত আলো বাতাসে ভরপুর। গ্রামগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে পূর্ব দিকে শায়েস্তাগঞ্জ হবিগঞ্জ রেলপথ এবং দক্ষিণ দিকে সিলেট ঢাকা রেলপথ চলে গেছে এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বাড়ীর দক্ষিণ সীমানায় লাগানো আছে নানা প্রজাতির গাছ গাছালি। কৃষ্ণচূড়া, শিমূল, কদম, ঝাউ সহ নানা ধরনের রকমারি সব ফুলেল ও অন্যান্য গাছ। বসন্তকালে যখন গাছে গাছে ফুল ফুটত তখন বাড়ীটির শোভা আরো অনেক অনেক বর্ধিত হত। সাহেব বাড়ীর সকল শরিকদের টিনের চৌচালা বসত ঘরের সামনে প্রত্যেকের নিজ নিজ বাংলা (বৈঠক)

ঘর। তারপর অনেকটা জায়গা খালি যেখানে ছোটরা অনায়াসে ফুটবল সহ নানা ধরণের খেলাধুলা করতে পারত। একেবারে সামনে চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা বাদ দিয়ে এজমালি পুকুর সাথে শান বাঁধানো ঘাঁট। ঘাঁট সংলগ্ন আরেকটি বাংলো ঘর। এই পুকুরে গ্রামের লোকজনত বটেই পাশের গ্রামেরও অনেকেই গোসল করতে আসত। কেউ বাধা দিত না। ঘাটে চৌধুরী বাড়ীর কোন কোন সদস্যের গ্রামের লোকজন নিয়ে জমজমাট আড্ডা পড়ন্ত বিকেল থেকে শুরু করে রাত অবধি চলত। পূর্ণিমার রাতে ঘাটের আড্ডা আরো মনোহর ও রোমাঞ্চকর মনে হত। এবং অনেক রাত পর্যন্ত গড়াত। ঘাটে বসে পূর্ণিমার চাঁদের দিগন্ত আলোকিত করে উত্থান পর্ব এবং পরে স্নিগ্ধ রুপালী আলো চারিদিকে ছড়িয়ে রাতের আকাশ পরিক্রমণের দৃশ্য অবলোকন অতীব মনোহর। এ দৃশ্য কবি মনকে করে আন্দোলিত আর ভাবুক মনকে করে বিমোহিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন না থাকায় পাকিস্তান আমলে ঘাট সংলগ্ন বাংলা ঘরটিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালান হত। আশেপাশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় কয়েক মাইল দূরের গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখনে পড়তে আসত। পুকুরের অপর পারে চিনা মাটির কারুকার্য খচিত দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। মুসল্লিদের পবিত্রতার জন্য ওজু বা গোসলের সুবিধার্থে মসজিদ সংলগ্ন ছিল আরেকটি শান বাঁধানো ঘাট। অদূরে এক কোনায় বহিরাগতদের সুবিধার্থে পাকা টয়লেটের ব্যবস্থা করে রাখা ছিল। রেলগাড়িতে যাতায়াতের সময় দূর থেকে ঝলমলে এই সুন্দর বাড়ীটি সবার চোখে পড়ত।

শায়েস্তাগঞ্জ হবিগঞ্জ রেলপথটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। শুনা গিয়েছিল রেলপথ বন্ধ করে এই সড়কটি হবিগঞ্জ শহরকে পাশ কাটিয়ে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের অংশ হবে। আমদের দেশে যা হয় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূতপূর্ব সরকারের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা বাতিল হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তির সুবিধা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তখন উন্নয়নের চাকা ঘুরতে থাকে। আগের প্রস্তাব অনুযায়ী সড়কটি তৈরি হলে হবিগঞ্জ জেলা শহরে যাতায়ত অনেক সহজ হত এবং এলাকাবাসীও উপকৃত হত। সিলেট গামী ট্রেনের মত তখন আর বাসেও শায়েস্তাগঞ্জ নেমে বিকল্প যানবাহনে হবিগঞ্জ যেতে হত না। যাহোক পরিত্যক্ত রেল পথের উপর নির্মিত এই সড়কের কিছুটা অংশ এখন আন্ত জেলা এবং অন্যান্য লোকাল বাস সার্ভিসের কাজে এসেছে। বাস গুলো হবিগঞ্জ শহরকে বাইপাস করে বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছে। এতে শহরের যানজট কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে।

দরিয়াপুর ও তদসংলগ্ন এলাকা এক সময় বেশ অপরাধ প্রবণ ছিল। ডাকাতি, চুরি, মারামারি ও রাহাজানি সহ নানা ধরণের ভয়ানক সব অপরাধ এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের আস্তানা আশেপাশের গ্রামে আছে এমন সন্দেহ পোষণ করা হত। এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে অধ্যক্ষ আদুর রব চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে এ, ডাব্লিউ চৌধুরী সাহেব বাড়ীতে পুলিশ চৌকি স্থাপন করেছিলেন। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ আমলের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত পালা করে একজন জমাদারের নেতৃত্বে তিন চার জন পুলিশ

সদস্য সার্বক্ষণিক উক্ত পুলিশ চৌকিতে পাহারায় থাকত। পুলিশ সদস্যরা থাকা খাওয়ার জন্য রব সাহেবের বাংলা (বৈঠক) ঘর ব্যবহার করত। এই উদ্যোগের ফলে উক্ত এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছিল।

এ, ডাব্লিউ চৌধুরী সাহেব নজিরউদ্দিন সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি এম, এ পাশ করে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে যোগ দেন এবং একজন চৌকস সেনা কর্মকর্তা হিসাবে মেজর পদে উন্নীত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে হবিগঞ্জে গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে সেনা বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে তিনি মেজর গণি ও মেজর ওসমানীর (পরবর্তীতে জেনারেল ওসমানী) সহযোগী ছিলেন। পরে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা নানাবিধ কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি সেনা বাহিনী থেকে ইস্তাফা দেন। পাকিস্তান সরকার তাঁর চাকুরী পুলিশে ন্যস্ত করলে তিনি এডিশনাল এস, পি পদে যোগ দেন। পুলিশ বিভাগেও তিনি কর্মদক্ষতার সাক্ষর রাখেন। তিনি খুবই প্রতিভাবান এবং তেজস্বী লোক ছিলেন। চাকুরীরত থাকা অবস্থায় অকালে মৃত্যু বরন করেন।

মহৎ প্রাণ অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রব চৌধুরী

দরিয়াপুর সাহেববাড়ী সুন্দরকরণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন সর্ব-জনাব আব্দুর রব চৌধুরী সাহেব। তিনি ব্রিটিশ আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করে কলেজ শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি আইনেও ডিগ্রী প্রাপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় কলেজ শিক্ষকতা শেষে তিনি সিলেট এম, সি কলেজ এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং রেজিস্ট্রার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার সম্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রব চৌধুরী চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। অবসরের পর তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন। রব সাহেব খুবই অমায়িক, সজ্জন, অতিথিপরায়ণ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। উনার শহরের বাসভবন সকল আত্মীয়স্বজনের জন্য অবারিত ছিল। অনেক নিকট ও দূরের আত্মীয়েরা উনার বাসায় থেকে স্কুল কলেজে পড়ালেখা করেছেন। অনেকে আবার কার্য্যোপলক্ষ্যে শহরে এলে উনার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন। রব সাহেব অথবা উনার পরিবারের পক্ষ থেকে মেহমানদের আতিথেয়তার কোন ঘাটতি কখনই থাকত না।

নজিরউদ্দিন সাহেবেরও জনাব রব সাহেবের ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের দোতলা বাসায় আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। পাকিস্তান আমলের গোঁড়ার দিকে সম্ভবত বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে উনার মায়ের চোখের ছানি অপারেশনের জন্য ঢাকায় যেতে হয়েছিল। তখন হাতে গুনা কিছু আত্মীয়-স্বজনের পরিবারের লোকজনেরই বসতবাটি শুধু ঢাকায় ছিল। বৃহত্তর সিলেটের খুব অল্প সংখ্যক পরিবারের লেখাপড়া জানা চাকুরীরত সদস্যরাই

কেবল পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকা অথবা বিভিন্ন শহরে থাকতেন। অনেকে আবার পরিবার গ্রামের বাড়ীতে রেখে নিজে মেসে থেকে চাকুরী করতেন। ঢাকায় তখন সেরকম ভাল কোন আবাসিক হোটেলও গড়ে উঠেনি। তাই কোন কাজে কেউ ঢাকায় অথবা অন্য কোন শহরে গেলে যত দূর সম্পর্কীয় হউন কেন আত্মীয়-স্বজনেরাই ছিলেন ভরসা। নজিরউদ্দিন সাহেব মায়ের চিকিৎসার জন্য আরো দুই তিন জন সঙ্গী নিয়ে রব সাহেবের বাসায় অতিথি হয়েছিলেন এবং উনাদের তত্বাবধানে থেকে পরিচিত ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে মায়ের চোখের সুচিকিৎসা করিয়েছিলেন। এরও আগে নজিরউদ্দিন সাহেব উনার বিয়ের পর পরই রব সাহেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে সিলেটে উনার বাসভবনে যান। রব সাহেব তখন সিলেট এম, সি কলেজের প্রিন্সিপাল। সন্ধ্যা হয়ে আসায় রব সাহেব উনাকে রাতের খাবার গ্রহন করে রাত্রি যাপন করতে বললেন। নজিরউদ্দিন সাহেব উত্তরে বললেন আমি আমার এক আত্মীয়ের বাসায় রাত কাটাব এবং ওখানেই রাতে খাবার গ্রহণ করব। রব সাহেব তখন বললেন আমি কি আপনার আত্মীয় নই। চাচাত ভাইয়ের মেয়ের জামাইয়ের প্রতি এই সৌজন্য বোধ ও অতিথিপরায়ণতা নজিরউদ্দিন সাহেবকে সেদিন মুগ্ধ এবং অভিভূত করেছিল। তিনি প্রায়ই সন্তানদের কাছে উচ্চ শিক্ষিত ও নিরহংকারী আব্দুর রব চৌধুরী সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন রব সাহেবকে বেহেশত নসীব করুন।

আমাদের সমাজে এবং আত্মীয়দের মধ্যে আগেও ছিল এখনো এমন অনেকেই আছেন যারা শিক্ষিত অথবা সচ্ছল হয়ে গেলে নিজেদের গুটিয়ে নেন। একটা কৃত্রিম প্রচ্ছন্ন আবরণ তৈরি করে আত্মীয় ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। যেন কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ অথবা কোন ভিন্ন গ্রহ বাসী। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষা মানুষকে অমায়িক এবং মনকে আরো অনেক অনেক উদার করে দেয়। মানবতা আর মহত্তের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। অন্যকে ঘৃণা করতে নয় ভালবাসতে শিখায়। গুটিকতেক লোক বাদ দিলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের যত কিছু মঙ্গল ও মহৎ কাজ প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতজনদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল। জনাব অধ্যক্ষ আব্দুর রব চৌধুরী সাহেব সেই ধরণের প্রকৃত শিক্ষায়ই শিক্ষিত হয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রব চৌধুরী সাহেবের সহধর্মিণীকে রত্নগর্ভা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। এই বিদুষী এবং সৌভাগ্যবতী মহিলা হবিগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় রব সাহেবের বড় ভাইয়ের সাথে যিনি পারিবারিক সহায় সম্পত্তি এবং জমিদারী তদারকি করতেন। এক কন্যা সন্তানের জন্মের পর প্রথম স্বামী অকালে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে অল্প বয়সে এই ভদ্রমহিলা বিধবা হন। রব সাহেবের পিতামাতা তাকে আর পিতৃগৃহে ফেরত পাঠান নি। নিজেদের উচ্চ শিক্ষিত ছেলে রব সাহেবের সাথে তাঁর বিয়ে

দেন। রব সাহেবও পিতামাতার আজ্ঞা পালন করে বড় ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করেন। তখনকার সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রয়াত স্বামীর ছোট ভাই বা দেবর উপযুক্ত থাকলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবাদের দেবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বামীগৃহে রেখে দেওয়া হত। জনাব আব্দুর রব চৌধুরী সাহেবের ঔরসে এবং এই মহীয়সী মহিলার গর্ভে নয়জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ছয় ছেলে এবং তিন মেয়ে। এরা সবাই একেকজন নক্ষত্র। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সময়ের প্রতিভাবান উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। তিন মেয়ের তিন জনই এম, এ পাশ। বড় মেয়ে উম্মে আয়েশা চৌধুরী (শফু) আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছেন। তিনি কর্মজীবনে ইন্সপেক্ট্রেস অফ কলেজেস এবং পরবর্তীতে রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে অবসরে যান। এরকম একটি উচ্চ পদে আসীন মুসলিম কোন মহিলা হবিগঞ্জে বোধহয় তিনিই প্রথম। তিনি বিয়ে করেন নি। দ্বিতীয় মেয়ে সাঈদা চৌধুরী (ওলি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সাহেবের সহধর্মিণী এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী বেগম আতিকুন্নেছা চৌধুরীর সমসাময়িক ও বান্ধবী। প্রথমোক্ত দুই জন এখন আর জীবিত নেই। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন উনাদের বেহেশত নসীব করুন। তৃতীয় মেয়ে লুলু চৌধুরী মেজর জেনারেল (অব:) ডাঃ আব্দুল হক সাহেবের সহধর্মিণী। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স।

রব সাহেবের বড় ছেলে মরহুম এ, ডাব্লিউ চৌধুরী সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ছেলে মরহুম আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তৃতীয় ছেলে মরহুম আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব সিলেট এম, সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতা পুত্র একই কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া বোধহয় আরেকটি বিরল দৃষ্টান্ত। চতুর্থ ছেলে মরহুম ডঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্লাইড ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি জার্মান লেডি বিয়ে করেছিলেন। এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ইস্তাফা দিয়ে জার্মানিতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন এবং বাকী জীবনটাও তিনি সেখানেই কাটিয়েছেন। পঞ্চম পুত্র জনাব আব্দুল খালেক চৌধুরী সাহেব ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মাস্টার্স। তিনি বাংলাদেশের সরকারীকৃত একটি ব্যাঙ্কের জেনেরাল ম্যানেজার পদে থেকে অবসরে গেছেন। সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে জনাব ডাঃ আব্দুর রকিব চৌধুরী ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্নাতক বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

উদারমনস্ক চৌধুরীগণ ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড

দরিয়াপুর সাহেববাড়ীতে বিধবা ভাতৃ-বধুকে দেবরের সঙ্গে বিবাহ সত্যিকার অর্থেই এক মহতী দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে পাত্র যখন উচ্চ শিক্ষিত পদস্থ কর্মকর্তা অথবা বিত্তশালী। পরিবারের সংহতি ও পিতামাতার আজ্ঞা পালনই এখানে মূখ্য। এই মহৎ কাজটি প্রথমে করেন অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রব চৌধুরী সাহেব। তিনি এক সন্তান সহ আপন বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। নজিরউদ্দিন সাহেবের শ্বশুর জনাব সরওয়ার চৌধুরী ওরফে

চাঁনমিয়া সাহেবও উনার পিতার আগ্রহে চাচাত ভাইয়ের বিধবাকে এক কন্যা সন্তান সহ বিয়ে করেন। আব্দুর রব চৌধুরী সাহেবের ছোট ভাই জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী সাহেবও (সাবেক বিভাগীয় কমিশনার) উনাদের অপর এক বড় ভাইইয়ের বিধবাকে এক পুত্র ও কন্যা সহ পিতৃ-মাতৃ আজ্ঞা পালন করে বিয়ে করেন। সৌভাগ্যবতী এই তিন মহিলাই তরফের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয়া ছিলেন। চাঁনমিয়া সাহেবের স্ত্রী এবং সালাম সাহেবের স্ত্রী একে অপরের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। এধরণের বিবাহে পারিবারিক সহায় সম্পত্তি যেমন রক্ষা পায় তেমনি পিতৃহারা নাবালক শিশুরা পিতৃসম একজন অভিভাবকও পায়। আব্দুস সালাম চৌধুরী সাহেব ব্রিটিশ আমলে আসাম সিভিল সার্ভিসের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি ডেপুটি কমিশনার হন এবং রাজশাহীতে বিভাগীয় কমিশনার থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী সাহেবের একমাত্র পুত্র মরহুম জনাব আব্দুল মুমিন চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত অমায়িক এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। উনার পত্নী সিলেট সদরের বিশ্বনাথ থানার রামপাশার বিখ্যাত হাসান রাজার পৌত্র প্রাক্তন মন্ত্রী দেওয়ান তৈমূর রাজা চৌধুরী সাহেবের আপন ভাগ্নি এবং হবিগঞ্জ সদরের নরপতি সাহেববাড়ীর সৈয়দ নুরুল হাসান (ইউসুফমিয়া) সাহেবের কন্যা। বৈবাহিক সুত্রে তাই তিনি মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও বেশ সুদর্শন ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে অবসরে যান। সালাম সাহেবের পৌত্রগণ বর্তমানে দরিয়াপুরে এতিমখানা, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় সহ নানাবিধ জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। এতে উক্ত এলাকার সাধারণ জনগণ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

দরিয়াপুর সাহেববাড়ীর শান বাঁধানো ঘাট সংলগ্ন বাংলা-ঘরটির আদুরেই তখনকার সময়ে সুপেয় পানির সুব্যবস্থার জন্য নলকূপ সবার জন্যে উন্মুক্ত করে রাখা ছিল। নিকট অতীতেও গ্রাম বাংলায় সুপেয় পানির খুবই অভাব ছিল। বেশির ভাগ গ্রামের লোকজন পুকুরের পানি পান করত। পানি ফুটিয়ে পান না করায় তখন পানি বাহিত রোগ বালাইয়ের প্রকোপ দেখা দিত। তন্মধ্যে কলেরা অন্যতম ছিল। প্রতি বছর কলেরায় অনেক মানুষের প্রাণহানি হত। মহান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ আমাদের সরকার গুলোর প্রচেষ্টায় গ্রাম বাংলায় এখন প্রচুর নলকূপ স্থাপন করে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। সাহেববাড়ীর এই নলকূপের পানি পার্শ্ববর্তী গ্রাম সহ সবাই ব্যবহার করেত পারত।

দরিয়াপুর চৌধুরী পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ঢাকা, সিলেট এবং হবিগঞ্জ শহরে বসবাস করেন বিধায় বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গ্রামের বাড়ীটির আগের সেই জৌলুশ আর নেই। কারো কারো রাজধানী ঢাকার আবাস সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমানে চতুর্থ প্রজন্ম চলছে। এখনকার জেনারেশনের অনেকে আবার আমেরিকা, কানাডা অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হয়েছেন। বর্তমানে ঢাকা ও সিলেটে বসবাসকারী কেউ

কেউ আবার শহরের আদলে গ্রামের বাড়ীতে দৃষ্টিনন্দন দালানকোঠা নির্মাণ করেছেন। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামে গ্রামে বিজলী পৌঁছে যাওয়ায় অনেক এলাকার গ্রাম আর আগের মত অজ পাড়াগাঁ নেই। তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগের কল্যাণে গ্রামেও এখন শহরের মত বিনোদন লাভ সম্ভব। আগে যেখানে এক দুই দিন গ্রামে থাকলেই শহুরে কেতাদুরস্ত লোকজন হাঁপিয়ে উঠতেন এখন তারাই অনায়াসে মাসেরও অধিক সময় গ্রামে এসে থাকছেন। এটাই বোধহয় নাড়ীর টান। পূর্বসূরিরা ছুটিছাটায় গ্রামের বাড়ীতে আসলেও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই শহরে থাকলেও খোলামেলা পরিবেশ এবং নির্মল আনন্দের জন্য গ্রামের বাড়ীতে নিয়মিত আসছেন।

দেশ ভাগের কারণে ভিটেমাটি ত্যাগী হাজারো মানুষ

একান্নবর্তী পরিবার এবং বৃদ্ধ বাবা-মা তখনো জীবিত থাকায় নজিরউদ্দিন সাহেব স্ত্রীকে আপাতত গ্রামের বাড়ীতে রেখে পুনরায় কর্মস্থল সুনামগঞ্জ কলেজে যোগ দিলেন। অবশ্য পরে ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে সুনামগঞ্জ শহরে বাসাবাড়ি করেন। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল পুরোটা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সিলেট বাসী মুসলমানদের মনে দুঃখ ক্লেশ থেকেই যায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বৃহত্তর সিলেটের করিমগঞ্জ এবং শিলচর এলাকা শিক্ষা দীক্ষা এবং আর্থসামাজিক অবস্থানের দিক থেকে সিলেটের অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে বেশ অগ্রগামী ছিল। পক্ষান্তরে হিন্দুদের দুশ্চিন্তা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাঁদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কি হবে। তাঁরা কি পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে? এই চিন্তা চেতনা থেকে অনেক হিন্দু পরিবারগুলো এখানকার সহায় সম্পত্তি ও উন্নত অবস্থান পিছনে ফেলে ভারতে পাড়ি জমাতে লাগলেন। এরই মধ্যে কলেজ শিক্ষক সহ অনেক পরিচিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সহায় সম্পত্তি ফেলে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন আবার কেউ কেউ ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। সবকিছু ছেড়ে ছোঁড়ে নিজের মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে এক অজানা ভবিষ্যতের টানে সবাই যেন পাগলপ্রায়। কিন্তু এমনতর হবার কথা ছিল না। সিলেট সহ পূর্ববাংলার সব জায়গাতেই হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে বাস করত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য পরিবেশ ছিল এখানে।

একইভাবে ভারত থেকে দলেদলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মোহাজের পাকিস্তানে আসতে লাগল। দুই দেশের কত লক্ষ পরিবার যে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ-পাকই ভাল জানেন। এখন দেশ ভাগের এত বছর পর এটা আজ সহজেই অনুমান করা যায় মাতৃভূমি ত্যাগী এই জন স্রোতের অধিকাংশই খুব একটা ভাল অবস্থানে নেই। পাকিস্থানের করাচীতে স্থানীয়দের সাথে মোহাজেরদের প্রতিনিয়তই দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এতে অনেক মানুষ হতাহত হচ্ছে। ভারতেও একই অবস্থা। আসাম রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মানুষগুলোকে

নানাভাবে নাজেহাল করা হচ্ছে বঞ্চিত করা হচ্ছে নাগরিক অধিকার থেকে। ধর্মভিত্তিক আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে দেশ ভাগ হলেও সিলেট সহ পূর্ব-বাংলার কোথাও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ সহ প্রতিটি মহকুমা শহর পাকিস্তান আমলেও হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে পালন করতে পারতেন। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় আচারাদি একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত। যেমন রোযার সময়। তখন যার যার সহনশীল অবস্থানে থেকে হিন্দুরা যেমন নির্বিঘ্নে পূজা অর্চনা করেছেন তেমনি মুসলমানরাও নিজেদের নামাজ রোজা পালন করেছেন এবং ঈদ উদযাপন করেছেন। কোন গোলযোগের অথবা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পর ধর্মে একে অপরের সহিষ্ণুতা এইত বাংলার জনসাধারণের আবহমানকালের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য। যদিও মহল বিশেষের উস্কানিতে দেশ ভাগের কিছু পূর্বে কলকাতা ও নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেক লোক হতাহত হয়। কলকাতার দাঙ্গায় আর্ত মানবতার সেবায় কিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মুসলমান-হিন্দু তরুণ তরুণী আত্মনিয়োগ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত ডায়েরী থেকে সে বিষয়ে বিশদ জানা যায়। মহাত্মা গান্ধী সহ শান্তি প্রিয় হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী অনেকদিন নোয়াখালীতে অবস্থান করেছিলেন।

সুনামগঞ্জ কলেজের প্রাথমিক সময়কাল

কলেজের শিক্ষাদান কর্মসূচী আগের মতই ঢিমেতালে চলছে। শুধু কলা অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও অনুষদের সকল বিভাগ ও বিষয় তখনো চালু করা হয়নি। নুতন কলেজ বিধায় ছাত্রছাত্রী এমনিতে আশানুরূপ ছিলনা তদুপরি আরবীতে ছিল আর কম। নজিরউদ্দিন সাহেব আশা করছিলেন দেশ ভাগ হয়ে সিলেট অঞ্চল পাকিস্তানে যুক্ত হলে হয়ত আরবীতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে কলেজের পরিবেশ ভাল থাকায় চাকুরীতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। দেশ ভাগের কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা আস্তে আস্তে স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে। নুতন রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হলেও ধীরে ধীরে পথ চলা শুরু করেছে। ছাত্র সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে। কয়েক বছরর মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আরবিতেও ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে তবে আশানুরূপ ছিল না। সময়ের সাথে সাথে কলেজ পরিচালনা কমিটিতে মুসলিম লীগের জাতীয় পরিষদ ও পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সহ স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন মুসলিম প্রফেসর যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দর্শন শাস্ত্রে জনাব দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সাহেব এবং ইতিহাসে জনাব আব্দুল হক সাহেব।

পাকিস্তানী অপরাজনীতি ও উর্দুভাষীদের প্রাধান্য

সবাই আশা করেছিল ধর্মীয় অনুভূতির ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও পাকিস্তান ইসলাম ধর্মের মূল নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নিবেদিতপ্রাণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সৎ নিষ্ঠাবান মুসলমান হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের গুণী লোকেরাই অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু অচিরেই তদানীন্তন পাকিস্থানের সরকারগুলোর অপশাসনের কারণে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের মোহভঙ্গ হয়। তারা তাদের বুকভরা আশা আকাঙ্ক্ষার গুড়ে-বালি দেখতে পায়। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি ছিল উর্দুভাষী উত্তর ভারতীয় নেতাদের হাতে। এরা অর্থ-বিত্তে ও শিক্ষা দীক্ষায় স্থানীয় হিন্দুদের থেকে এগিয়ে ছিল। তাঁরা মনে করত ইংরেজরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাই খণ্ডিতভাবে হলেও ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা তাদের প্রাপ্য। তাদের আশঙ্কা ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভোটাভোটির রাজনীতিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের পদাবনত হয়ে থাকতে হবে। এজন্যেই এরা সর্বভারতীয় সাধারন মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুঁজি করে মুসলিম লীগের পতাকা তলে তাদের একত্রিত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এরা পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে মোহাজের হয়ে সংঘবদ্ধ ছিল। এদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাই উর্দুকে পাকিস্থানের প্রধান রাষ্ট্রভাষা করে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা প্রথম থেকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। জিন্নাহ সাহেবও এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরেন। তিনি ১৯৪৮ সালে শেষবারের মত ঢাকায় এলেন। অবশ্য এর পরে আর বেশিদিন তিনি জীবিত ছিলেন না। নজিরউদ্দিন সাহেব জিন্নাহ সাহেবকে খুব পছন্দ করতেন তাই আবারো কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য ঢাকায় এলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব সমবেত শ্রোতাদের আশাহত করে নিজে উর্দুভাষী না হয়েও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন। সভাস্থলে এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। নজিরউদ্দিন সাহেবও অনেকের মত আশাহত হয়ে এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে সুনামগঞ্জ ফিরে এলেন। তার মত তরুণ মুসলিম লীগ কর্মীরা শাসক চক্রের এহেন আচরণে মর্মাহত হন এবং যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন।

লিয়াকত আলী খানের আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণে এই কায়েমি স্বার্থবাদী গুষ্ঠির নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্থানের পাঞ্জাবী সামরিক ও বেসামরিক উর্দুভাষী আমলাদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। এই কুচক্রী মহল রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছিল। এদের কূট কৌশলের কারণে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন তথা গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ দীর্ঘায়ীত হতে থাকে। গণতন্ত্রে উত্তরণে গড়িমসির কারণে শাসক চক্রের মুখোশ অচিরেই উন্মোচিত হয়। পূর্ব বাংলায় শাসকশ্রেণীর পদলেহী একদল চাটুকার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। যারা জনকল্যাণত দূরের কথা অবাস্তব পরামর্শ দিয়ে পরিস্থিতি আর জটিল করে তুলে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়া শাসকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ

ঘটায়। পক্ষান্তরে কুচক্রী মহলের পরামর্শে ও প্ররোচনায় জিন্নাহ সাহেবের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা বাঙালী মন-মানস প্রবল ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আকাংখায় বাঙালী মনকে আরো উজ্জিবীত ও জাগ্রত করে দেয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

এরপর থেকে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বাসনা বাঙালি ছাত্র বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত সমর্থিত হতে থাকে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব বাঙালী সদস্যদের দ্বারা উথাপিত হলেও এই লক্ষ্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আর পরে খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেব পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আবারো উর্দুকে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে ঘিতে আগুন ঢেলে দিলেন। ছাত্র জনতা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে পূর্ব-বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমনের জন্য বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন ক্ষমতাসীন নুরুল আমিন সরকারের নির্দেশে ঢাকার রাজপথে ছাত্র জনতাকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে কয়েকজন শহীদ হন। এই শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করা হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পূর্ববাংলার বাঙ্গালীরা আজ গর্বিত স্বাধীন জাতি। আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা পৃথিবীতে আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ভাষা। আমাদের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করতে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দিয়েছে। যথারীতি এই দিবস আড়ম্বরের সাথে পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হচ্ছে।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সুনামগঞ্জেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্র জনতার আন্দোলন হয়। সুনামগঞ্জ কলেজে তখন দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সাহেব প্রিন্সিপাল এবং নজিরউদ্দিন সাহেব ভাইস-প্রিন্সিপাল। দুজনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর নৈতিক সমর্থক ছিলেন এবং কলেজে ছাত্রদের এই ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করতেন। দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সুনামগঞ্জ শহরের প্রভাবশালী জমিদার মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার দৌহিত্র এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার দুহালিয়ার জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। দেওয়ান আজরফ সাহেবের মাতামহীর পিত্রালয় ছিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার খাগাউরা গ্রামে। সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী পরিবার। নজিরউদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ী উজিরপুর এবং খাগাউরা পাশাপাশি গ্রাম। দূর সম্পর্কে আত্মীয়তাও আছে। আজরফ সাহেব ফিলসফিতে এম, এ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি সম্পন্ন অত্যন্ত সজ্জন ও অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও উনার প্রজ্ঞার কোন কমতি ছিল না। তাই দুজনের

মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে উঠে। নজিরউদ্দিন সাহেব উনাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। দেওয়ান আজরফ সাহেব বছর কয়েকের মাথায় কলেজের ছাত্র অসন্তোষের কারণে নিজে থেকে অধ্যক্ষ পদে ইস্তাফা দিয়ে অন্যত্র চলে যান।

সুনামগঞ্জ ছেড়ে যাওয়া যেন উনার জন্য আশীর্বাদ সরুপ বর হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন উনার সম্মান আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি ও মহিমান্বিত করার লক্ষ্যেই হয়ত সুনামগঞ্জের আবাস বদলিয়ে উনাকে আরো বৃহত্তর পরিসরে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তিনি আজ বাংলাদেশের সর্বত্র একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং জ্ঞানী বিশিষ্ট জন হিসাবে পরিচিত। কয়েকটি কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি ঢাকার মালিবাগে আবু-জর গিফারী কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ্যের দায়িত্বও পালন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করার হাত ছিল উনার। অচিরেই লেখালেখিতে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। উনার অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখালেখি অল্প সময়েই পাঠক সহ বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত হতে থাকে এবং তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। চারিদিকে উনার প্রজ্ঞাময় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সভা সেমিনারে দর্শকশ্রোতা অপূর্ব মুগ্ধতায় উনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করতেন। বাংলাদেশ সরকার উনাকে জাতীয় অধ্যাপক খেতাবে ভূষিত করে যথোপযুক্ত সম্মানিত করেছে। সুনামগঞ্জত বটেই বৃহত্তর সিলেট বাসীও উনার পরিচিতি ও সম্মানে গর্বিত। তিনি তার মাতামহ হাছন রাজার মত সর্ব মহলে সিলেটের তথা সুনামগঞ্জের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। মাতামহ দেওয়ান হাছন রাজা ছিলেন মরমী কবি আর তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ্ ও রসুলে ভক্ত অনুরক্ত প্রজ্ঞাবান দার্শনিক।

পাকিস্থানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খান

পাকিস্তানের রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থায় কখনই স্থিতিশীলতা আসেনি। বিংশ শতকের ষাটের দশকে পাকিস্থানের রাজনীতিতে টালমাটাল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্থানের জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়। ক্ষমতার ভাগাভাগির লড়াইয়ে একের পর এক সরকার আসছে আর যাচ্ছে। অস্বাভাবিক নিয়মে কখনো প্রধানমন্ত্রী আবার কখনো গভর্নর জেনারেল পদচ্যুত হচ্ছেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কোন্দলের কারণে কোন সরকারই টেকসই হতে পারছে না। নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথে না হেটে রাজনৈতিক দলগুলো নানাবিধ কোন্দল, কাঁদা ছুঁড়াছুঁড়ি এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের কারণে পরিস্থিতির দিনদিন আরো অবনতি এবং জটিল হতে থাকে। এই সুযোগে সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান

সামরিক শাসন জারী করে সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করেন। এক পর্যায়ে হ্যাঁ না গণভোট দিয়ে তিনি পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট পদ দখল করে বসেন।

ক্ষমতায় টিকে থাকতে তিনি এক অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভাবন করলেন। নাম দিলেন মৌলিক গণতন্ত্র। এরপর সর্বজন পরিচিত ও গ্রাহ্য গণতন্ত্র নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজস্ব ধারার এই মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দুর্দান্ত প্রতাপে পাকিস্তান শাসন করতে থাকেন। মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামোই ছিল একদল সুবিধাভোগী তৈরি করে ক্ষমতায় টিকে থাকা। আইয়ুব খানের এই সুবিধাবাদী গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে পূর্ব-বাংলায়ও সরকারের ছত্রছায়ায় একদল পদলেহী চাটুকার এবং ক্ষমতা লোভী লুটেরা শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়। এদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ছাত্রদের মধ্য থেকেও ছাত্র ফেডারেশন নামে মুষ্টিমেয় ছাত্র-অছাত্র সমন্বয়ে সরকারের পেটোয়া ও গুণ্ডা বাহিনী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠন করা হয়। এরা শিক্ষাঙ্গন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতির উত্থান

ব্রিটিশ শাসনের শেষ সময় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দশক থেকে পূর্ব বাংলার বৃহত্তর ছাত্র সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অতি দ্রুততায় এরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন নামে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে উঠে। বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জ সহ সব জায়গাতেই স্কুল কলেজের শতকরা নব্বই পঁচানব্বই ভাগ ছাত্রছাত্রী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক হয়ে উঠে। যে কারনে কলেজের ছাত্র সংসদগুলোতেও তাদেরই প্রাধান্য ছিল। তবে অচিরেই চীন ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক তাত্বিক প্রশ্নে এরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। তবে ছাত্র সংসদগুলোতে তাদের যে কোন এক গ্রুপের প্রাধান্য বজায় থাকে। সুনামগঞ্জের ছাত্র সমাজও এই ধারার ব্যতিক্রম ছিল না। যদিও ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্থানের অন্যান্য বড় শহরগুলোতে আগেই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের ভাব আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রলীগ গঠিত হয়েছিল কিন্তু বৃহত্তর সিলেটে এই ছাত্র সংগঠনের শিকড় তখনো ভালভাবে গড়ে উঠেনি।

তবে এর কিছুদিন পরে সত্তরের দশকে সুনামগঞ্জে তখনকার ছাত্রনেতা জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সভাপতিত্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্রের সমন্বয়ে ছাত্রলীগ যাত্রা শুরু করে। জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী নজির উদ্দিন সাহেবের শ্যালক এবং উনার বাসায় থেকে সুনামগঞ্জে স্কুল এবং কলেজে পড়াশুনা করেছেন। তিনি লেখাপড়া শেষে হবিগঞ্জে চলে আসেন। হবিগঞ্জ আওয়ামী লীগ এবং কিছু সময়ের জন্য হবিগঞ্জ বিনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী এখনো নিজ গ্রামের বাড়ী দরিয়াপুরে সেই গৌরবময় অতীত স্মৃতি হাতরে বেড়ান। তিনি

সুনামগঞ্জ ছেড়ে আসলে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতায় পরবর্তী কয়েক বছর স্থবিরতা দেখা দেয়। পরে সত্তর দশকের শেষ দিকে সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র দিরাইয়ের সুজাত মিয়া চৌধুরী ছাত্র লীগের সুনামগঞ্জ শাখার কাণ্ডারি হিসাবে আবির্ভূত হন। তাকে মাঝে মধ্যে বেশ তৎপর হতে দেখা গেলেও হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যেতেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন হুলিয়া (গ্রেফতারী পরোয়ানা) মাথার উপরে ভনভনিয়ে ঘোরার কারণে কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলাম। তবে সুজাত মিয়া হাল ছাড়েন নি। এরপর সুনামগঞ্জের ছাত্র সাধারণের ছাত্র লীগের সাথে সম্পৃক্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুনামগঞ্জ কলেজের কতিপয় ক্ষণস্থায়ী অধ্যক্ষবৃন্দ

বৃহত্তর সিলেটের বাইরে থেকে আসা অধ্যক্ষ সাহেবগণ স্থায়ী হতেন না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং সাংসারিক নানাবিধ কারণে অধ্যক্ষ সাহেব একাই সুনামগঞ্জে থাকতেন আর পরিবার থাকত অন্য কোন সুবিধা মত জায়গায়। সুনামগঞ্জ শহরের দূরত্ব এবং প্রতিকূল ও সময় সাপেক্ষ যাতায়ত ব্যবস্থার কারণে কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের সুবিধা মত জায়গায় নুতন চাকরী নিয়ে তারা চলে যেতেন। এজন্যে অধ্যক্ষ পদে প্রায়ই শূন্যতা বিরাজ করত। অধ্যক্ষ হিসাবে দেওয়ান মোঃ আজরফ সাহেবের প্রস্থানের পর থেকে ক্ষণস্থায়ী বিভিন্ন মেয়াদে অধ্যক্ষ এসেছেন আবার কখনো নজিরউদ্দিন সাহেব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষণস্থায়ী অধ্যক্ষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জনাব শামস, জনাব ক্যাপ্টেন করিম উদ্দিন সাহেব এবং জনাব এম, এ, কুদ্দুছসাহেব। উনাদের মেয়াদ কাল সম্ভবত এক থেকে দেড় বছর ছিল। কুদ্দুছ সাহেব নজিরউদ্দিন সাহেবের সহপাঠী ছিলেন। তিনি আরবীতে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত এম, এ ছিলেন। উনার এক ছেলে আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত নাট্য ব্যক্তিত্ব। ক্যাপ্টেন করিম উদ্দিন সাহেব বেশ চৌকস এবং জাঁকজমকপূর্ণ লোক ছিলেন। ছাত্রদের সব সময় হাওয়াই সার্ট প্যান্টের সঙ্গে ইন করে পরতে বলতেন। কোন ছাত্র এর অন্যথা করলে সর্বসমক্ষে লজ্জা দিতেন। আরো একজন মাস্টার্সে (এম,এস,সি) তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত আধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। শিষ্টাচার বহির্ভূত বিধায় উনার নাম প্রকাশ করা গেল না। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে তিনি কয়েক মাসের মাথায় নিজে থেকে ইস্তাফা দিয়ে চলে যান।

অপূর্ব শোভামণ্ডিত নুতন কলেজ ক্যাম্পাস

কলেজের ছাত্র সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে পুরাতন কলেজ প্রাঙ্গণে স্থান সংকুলান দুষ্কর হয়ে পড়ে। কলেজ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সম্প্রসারিত জায়গায় কলেজ স্থানান্তরের প্রয়াস নিলেন। অবশেষে শহরের পূর্ব উপকন্ঠ কুঁড়িয়ারপাঁর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে নূতন কলেজের জন্য স্থান নির্ধারিত হয়। আগেই বলা হয়েছে কলেজের জন্য অধিকৃত জমির সিংহভাগই মরমী কবি হাছন রাজার পুত্র লক্ষনশ্রীর জমিদার দেওয়ান

আফতাবুর রাজা সাহেব তাদের পারিবারিক সম্পত্তি থেকে দান করেছেন। নিচু জমি ভরাট করতে হবে এবং শহরের সঙ্গে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। বিরাট কর্মযজ্ঞ। কয়েক বছরের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অধ্যক্ষ সাহেবদের এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিনন্দন নূতন কলেজের কাজ সমাপ্ত হয়। শহরবাসীর বিশেষ করে তরুণদের বৈকালিক ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই নুতন কলেজ প্রাঙ্গণ।

কলেজ এলাকায় বিশালাকার দীঘি খনন করা হয়েছে এবং এর উত্তর পাঁড়ে টিন শেডের নুতন কলেজ ভবন তৈরি করা হয়েছে। দিঘীর লাগোয়া দক্ষিণপূর্ব কোণে নির্মাণাধীন অধ্যক্ষের জন্য দোতলা বাসভবন। কলেজ ভবনে রয়েছে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, অডিটোরিয়াম আর বেশ বড়সড় একটি কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে লাইব্রেরী। তখনকার সময়ের জন্য লাইব্রেরিটি বেশ আধুনিক ছিল। হরেক রকমের ম্যাগাজিন, বাংলা ইংলিশ পত্রিকা, পাঠ্য বই এবং রেফারেন্স বই সহ সব ধরণের বই পুস্তকের কোন ঘাটতি এই লাইব্রেরীতে ছিল না। কলেজ ভবনের সামনেই করা হয়েছে খুব সুন্দর ফুলের বাগান। বাগানে আছে বিভিন্ন জাতের ফুলের সমারোহ। বাহান্নর ভাষা শহীদদের স্মরণে বাগানের কেন্দ্রস্থলে শহীদ মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাস এবং সংযোগ সড়কে লাগানো হয়েছে অনেক অনেক গাছ। অতি সুন্দর ছায়া সুনিবিড় আলো বাতাসে ভরপুর পরিবেশ। সত্যিকার অর্থে তখনকার সময়ে সুনামগঞ্জ শহরের একটি দর্শনীয় স্থান ছিল নুতন কলেজ প্রাঙ্গণ। অধ্যক্ষ মান্নান সাহেবের বাসস্থানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে উনার কি সমঝোতা বা চুক্তি হয়েছিল জানা না গেলেও তিনি কলেজ ভবনে কখনো লাইব্রেরী রুম, কখনো লেডিস কমনরুম আবার কখনো অডিটোরিয়ামের একাংশ দখল করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এতে কলেজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে ব্যহত হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তরুণদের বৈকালিক খোলামেলা আলো বাতাসে ভ্রমণও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মাঝেমধ্যে অধ্যক্ষ মান্নান সাহেব নিজে তরুণদের বিকালে ঐদিকে যেতে বারণ করতেন আবার অনেকেই সমীহ করে আর ঐ পথ মাড়াত না। তিনি অবশ্য পরে উনার বাসস্থান অন্যত্র সরিয়ে নেন। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসের খুবই দৈন্যদশা যা কোনভাবেই কাম্য নয়। সবকিছুই আগের আদলে আছে কিন্তু খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। সংযোগ সড়কটিরও বেহাল অবস্থা। গাছ গাছালি আর আগের মত নেই। নুতন করে আরো অনেক গাছ লাগানো প্রয়োজন। কলেজটি সরকারীকরণ হয়েছে অনেক বছর। আমাদের দেশও এখন স্বাধীন। সুনামগঞ্জবাসীর উচ্চ শিক্ষার পুরাতন এই বিদ্যাপীঠের আরো অধিক জৌলুশ থাকা প্রয়োজন। সুদূর অতীতে আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দৃষ্টিনন্দন কলেজটির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা কি এতটাই দুষ্কর। আশাকরি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কলেজ প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে এই ব্যাপারে আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কলেজের উন্নয়নে বিবিধ প্রয়াস

কলেজর একাডেমীক কার্যক্রম নূতন ভবনে যাত্রা শুরু করেছে বেশ কিছুদিন। নজিরউদ্দিন সাহেব আবারো দীর্ঘদিনের জন্য অধ্যক্ষের দায়িত্বে। সাড়া সুনামগঞ্জ মহকুমায় একটি মাত্র কলেজ। শুধু কলা অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু এবং অনুষদের অনেক বিষয় চালু না করা গেলেও কলেজের ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছাত্রদের চাহিদা এবং যুগের দাবী মেটাতে ইতিমধ্যে শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে কলেজে বিজ্ঞান অনুষদ চালু করা হয়েছে। কলা বিভাগের সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের চিন্তা ভাবনা চলছে। অন্যান্য বিষয়েও পর্যাপ্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ছিল না অথবা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তিনি পরিচালনা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে যোগ্যতায় কিছুটা শিথিলতা আনয়ন করে ছাত্রদের কল্যাণে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেন। সংস্কৃত বিষয়ে যাকে নিয়োগ দেয়া হয় তিনি একটি স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে সংস্কৃত ভাষায় এম, এ সম্পন্ন করেন। একইভাবে ইংরেজিতে সুনামগঞ্জ পাবলিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আলী ফরিদ সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আলী ফরিদ সাহেব ইংরেজীর খুবই নামজাদা শিক্ষক ছিলেন। কলেজ শিক্ষকতায়ও তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। অতি অল্প সময়ে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগে বৃহত্তর সিলেটে এম, সি কলেজের পরেই সুনামগঞ্জ কলেজের অবস্থান চলে আসে। তাই অনেক ছাত্রই বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন জায়গা থেকে সুনামগঞ্জ কলেজে আই, এস, সি পড়তে আসতেন। ইতিমধ্যে কলেজে কমার্স বিভাগ চালু অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। আবারো সেই একই সমস্যা। যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক সংকট। নজিরউদ্দিন সাহেব সুনামগঞ্জ পাবলিক হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু করুণাময় চৌধুরী বি, কম কে অনুরোধ করলেন কলেজে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি সাড়া দিলে কলেজে বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। এভাবেই নজিরউদ্দিন সাহেবের প্রয়াসে কলেজের প্রাথমিক সময়ে ছাত্র কল্যাণে বিভিন্ন বিভাগ চালু করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হয়।

কলেজ পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষকের মতামতের প্রাধান্য

নজিরউদ্দিন সাহেব দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। দায়িত্ব পালন কালে তিনি কলেজের উন্নয়ন অথবা ছাত্র কল্যান সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সহকর্মী জ্যেষ্ঠ প্রফেসর, ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এতে তখনকার সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট গুটিকতক ছাত্রের সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন তাদের অগণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে উনার বিরুদ্ধাচরণ করত। ঐ সংগঠনের ছাত্ররা সামান্য বিষয় নিয়ে উনার বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল করত, এমনকি পুরাতন কলেজ প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করে উনার তীব্র সমালোচনা করত। যেহেতু এরা সরকারেরই সমর্থনপুষ্ট ছাত্রের দল তাই সরকারের ভাবধারার কলেজ পরিচালনা পর্ষদের কোন কোন সদস্য

উনার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু নজিরউদ্দিন সাহেব তার নীতি এবং বিশ্বাসের উপর অটল থেকে দায়িত্ব পালন করতেন। উনার কলেজ পরিচালনা কালীন সময়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এবং অধিকাংশ শিক্ষক মণ্ডলী সন্তুষ্ট থেকেছেন এবং তিনি তাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব আরবীতে এম, এ পাশ করলেও ইংরেজিতে উনার দক্ষতা খুবই ভাল ছিল। মাদ্রাসার ছাত্র হওয়া এবং আরবীতে মাস্টার্স করার কারণে তিনি ফার্সি এবং উর্দু ভাষাও বেশ ভাল জানতেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব কালে কলেজের কোন কোন অনুষ্ঠানে কখনো কখনো উনাকে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেও দেখা গেছে।

কলেজ পরিচালনা কমিটির মূল্যায়নে ব্যর্থতা

নজিরউদ্দিন সাহেবের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার বেশ দীর্ঘায়িত হয়ে বছরর অধিক অতিক্রান্ত হলেও সরকার দলীয় পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য মনে করতেন তিনি মৌলভী মানুষ অধ্যক্ষের গুরু দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু সকলের দৃষ্টির সামনেই তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব সফল ভাবে পালন করে চলেছেন। সহকর্মী এবং বৃহত্তর ছাত্র সমাজ উনার কলেজ পরিচালনায় সন্তুষ্ট। পরিচালনা পরিষদের উক্ত সদস্যগণ সরকারের অনুগত ছাত্র সংগঠন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাদের ধারণা ছিল সাহেবিয়ানা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান ব্যাতীত অধ্যক্ষ পদে মানায় না। এই ধরনের নেতিবাচক ধারণার কারণে দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকলেও কর্তৃপক্ষ উনাকে অধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন অনুমোদন দেয়নি। বৃহত্তর সিলেটের বাইরে থেকে আসা অধ্যক্ষ স্থায়ী হন না তাই অবশেষে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা হীন ইসলামের ইতিহাসে এম, এ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা নিবাসী জনাব আব্দুল মান্নান চৌধুরী সাহেবকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। নজিরউদ্দিন সাহেব নিয়তির বিধান মেনে নিয়ে তার পূর্ব পদে ফিরে গেলেন। আরবীতে ছাত্র সংখ্যা আগে থেকেই কম ছিল তাই ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এম, এ করার চিন্তা ভাবনা উনার ছিল। কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। নূতন অধ্যক্ষ মান্নান সাহেবের কোন কোন পদক্ষেপ হয়ত সেসময়ে শিক্ষকদের একাংশকে ক্ষুব্ধ করে তুলে যার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। ছাত্র নেতারাও অধ্যক্ষ সাহেবের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। এসব কারণে সংক্ষুব্ধ অনেক শিক্ষক এবং ছাত্র নেতারা বিভিন্ন সময়ে নজিরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে উদ্ভূত ব্যাপারে শলাপরামর্শ করতে উনার কাছে আসতেন কিন্তু তখন উনার কি বা করার ছিল। সবাইকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি সত্যের প্রতি অবিচল ও ন্যায়নিষ্ঠ থাকেন তাহলে সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থা অর্জন অসম্ভব নয়।

সংসার ও ব্যক্তি জীবন

নজিরউদ্দিন সাহেব সুনামগঞ্জ শহরের হাছননগর এলাকায় ভাড়া করা বাসায় পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতেন এবং কলেজ থেকে প্রাপ্ত সম্মানী দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। যদিও গ্রামের বাড়ীতে উনার যথেষ্ট সহায় সম্পত্তি ছিল। ওখানকার আয় নিজের সংসারে খরচ করতে আগ্রহ পোষণ করতেন না। চাকুরীরত থাকাকালীন গ্রামের বাড়ীর সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য সহায়তায় ব্যয় করা হত। অবশ্য অবসর গ্রহণের পর উনাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই ওই আয়ের দিকে নজর দিতে হয়। তিনি খুবই সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। সাহেবিয়ানা ঢঙ্গে চলাফেরা করতে পছন্দ করতেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জনে যেমন আগ্রহী ছিলেন না তেমনি অপ্রয়োজনীয় খরচও পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম সব নিজেই করতেন। সংসার যখন ছোট ছিল পরিবারের সদস্যদের কাপড় চোপড় ধোপা বাড়ীতে ধোলাইয়ের জন্য পাঠানো হত। আস্তে আস্তে পরিবার বড় হয়ে ব্যয়বহুল হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুয়ে দিতেন। বড় হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের নিজের কাজ নিজেদের করতে বলতেন। বাসার অনেক টুকিটাকি কাজ তিনি নিজেই করে নিতেন। এতে উনার কোন হীনমন্যতা ছিল না। যেমন বাঁশের তৈরি সীমানা বেড়া ঝড় বৃষ্টিতে হয়ত কিছুটা হেলে পরেছে তিনি নিজেই অনেক সময় খুঁটি লাগিয়ে সোজা করে দিতেন। সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয়। বাসায় ঢোকার রাস্তাটা হয়ত কাঁদা পানিতে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে গেছে। তিনি নিজেই দুটো বাঁশ অথবা একখণ্ড কাঠের টুকরো চলাচলের সুবিধার জন্য ফেলে রাখতেন। সামান্য কাজ কর্মের জন্য তিনি কখনো দিন-মজুর শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী হতেন না। ছেলেমেয়েরা কোন সময় দামী কাপড় চোপড় কিংবা আসবাবপত্র কেনার আবদার করলে বিলাসিতা বা ব্যয়বহুল বলে পাশ কাটিয়ে যেতেন। তিনি নিজেও বেশভূষায় অতি সাধারণ ছিলেন যে কারণে প্রথম সাক্ষাতে উনাকে যে কারো পক্ষে অবমূল্যায়ন করাটাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল। বাসাবাড়ির আসবাবপত্রও ছিল অতি সাধারণ আরো পাঁচ-দশটা চাকুরীজীবী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মত। বাইরে থেকে সংসার বিষয়ে উদাসীন মনে হলেও আসলে তিনি ছেলেমেয়েদের প্রতি খুবই যত্নশীল এবং পরিবারের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন আদর্শ ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে গড়ে উঠার জন্য সবসময় অনুপ্রাণিত করতেন। বাসায় অবস্থান কালে পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অলোচনা করতেন। অলোচনার সিংহভাগই আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম, মহানবী (সঃ), সাহাবী গন এবং বিভিন্ন আলেম উলামাদের নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকত। কিভাবে আমাদের মহানবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ইসলাম ধর্মের নীতি আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনে অবিচল থেকেছেন। সংকট মুহূর্তে রসুল (সঃ) নেতৃত্বে আস্থাশীল থেকে সবাই একতাবদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি মহানবী (সঃ) বিভিন্ন

সংকট কিভাবে মোকাবেলা করতেন এসব নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। আর সেজন্য সবাইকে মহানবী (সঃ) নীতি আদর্শ মেনে জীবন গড়তে পরামর্শ দিতেন।

নজিরউদ্দিন সাহেব সন্তানদের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নবীজির নির্দেশনা অনুযায়ী পারিবারিক ভাবে আলাপ আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতেন। নবী পরবর্তী ইসলাম ধর্মের ইমামগণ এবং উপমহাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের আলেম উলামাদের নিয়েও আলোচনা করতেন। বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী(র:), হযরত শাহ জালাল (র:), হযরত খাজা মইন উদ্দিন চিশতী (র:), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র:) সহ অনেক আউলিয়া দরবেশদের ইসলামের খেদমতে তাদের কর্মময় জীবন নিয়ে সন্তানদের আলোকপাত করতেন। বিগত শতকের উপমহাদেশের হক্কানি আলেম যেমন হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) সাহেব, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানি (র:) সাহেব এবং পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম ও মুফতি মওলানা মুফতি মাহমুদ (র:) সাহেবের ইসলামী ভাব ধারার চিন্তা চেতনা ও কর্মময় জীবন নিয়েও আলোচনা করতেন। সেই রকম একজন বিশিষ্ট মুফতি এবং বড় ধরনের আলেম দিল্লীর হযরত মওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের উর্দু ভাষায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কিতাব সমূহ নজিরউদ্দিন সাহেবকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। উক্ত মনিষীর লেখায় তিনি এতটাই বিমোহিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিজের বড় ছেলের নামাকরন উক্ত মনিষীর নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন। উল্লেখিত মহান মহান আলেম উলামাদের জীবনীর বিশেষকরে আমাদের মহান এবং পবিত্র ধর্ম ইসলাম সম্পর্কিত শিক্ষনীয় দিক গুলো গুরুত্ব সহকারে সন্তানদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য সন্তানদের পরামর্শ দিতেন।

শুধু ইসলামি চিন্তাবিদ এবং আলেমগণ নন সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং পরিবারের শিক্ষিত ও সফল ব্যক্তিত্ব যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন অথবা শুনেছেন তাদের নিয়েও বাড়ীতে আলোচনা করতেন। উনার আলোচনা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও বাদ পরতেন না। যেমন ব্রিটিশ ভারতের তুখোড় কংগ্রেস দলীয় রাজনীতিবিদ ছিলেন বিপিন পাল মহোদয়। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পইল গ্রামের অধিবাসী। অত্যন্ত মেধাবী এবং অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তার বাগ্মিতা সাড়া ভারতবর্ষে তখন সর্বজনবিদিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আজ আমাদের সমাজে আর ততটা সুপরিচিত নন। যদিও স্থানীয়ভাবে পইল গ্রামে বিপিন পাল স্মৃতি সংসদ মাঝেমধ্যে উনাকে স্মরণ করে কিছুটা হলেও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিপিন পাল ছাড়া আরো একজন সমসাময়িক কংগ্রেস দলীয় রাজনীতিবিদের কথা বলতেন। তিনি হলেন হবিগঞ্জ নিকটবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গুনিয়াওক গ্রামের বড়বাড়ির ব্যারিস্টার জনাব আব্দুর রসুল সাহেব। তিনি ও বিপিন পাল প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। শৈশবে প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠা এবং পরে আত্মীয় স্বজন দ্বারা বঞ্চনা গঞ্জনার শিকার হয়ে বালক আব্দুর রসুল নিজ বাড়ী থেকে পালিয়ে বাঁচেন। দিল্লী বোম্বাই হয়ে এক মাড়োয়ারির সহায়তায় বিলেতে পৌঁছেন।

কয়েক বছর বিলেতে অবস্থান করে এক সময় ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আইন ব্যবসা শুরু করলে আস্তে আস্তে এই পেশায় ব্যাপক পসার লাভ ঘটে। কংগ্রেসের রাজনীতিতেও জড়িত হন। উনার নাম ডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে আত্মীয় স্বজনদের চরম অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে এক সময় তিনি বাড়ী ত্যাগ করেছিলেন তারাই পরে গর্ব করে উনার পরিচয় দিতে আহ্লাদিত হতেন। বিপিন পাল এবং ব্যারিস্টার এ, রসুলের মত মহৎ ব্যক্তিত্বরা আমাদের সমাজে আজ বিস্মৃত প্রায়। এই মহাত্মাদের অসামান্য অবদানের কারণে এই উপমহাদেশের মানুষদের প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া সহজতর হয়েছিল। অতীত নিয়ে পড়ে থাকা ভাল নয়। কিন্তু যারা সমাজ সংসার এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থেকে কাজ করেছেন তাদের কর্মধারা থেকে শিক্ষা নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আলোকিত হয় সর্বোপরি দিক নির্দেশনা পায়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা হয় তাকে সম্মান দান করেন। আবার সেই সম্মান ফিরিয়ে নিতেও দ্বিধা করেন না। নজিরউদ্দিন সাহেব সন্তানদের বলতেন একজন মানুষ তার মেধা, অধ্যবসায় এবং শ্রম দিয়ে আল্লাহ্র মেহেরবানী হলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার পরিবারকে আলোকিত করে গৌরবের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। পরিশ্রমী, সৎ ও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের উপর আস্থাশীল ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই কেবল ইহজগৎ ও পরজগতে পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখতে পারেন।

তিনি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সব সময় তদারকি করতেন। নিজেও পড়াতেন এবং প্রয়োজন হলে গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিতেন। কলেজের অনেক মেধাবী ছাত্র সম্মানীর বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান করেছেন। মুখস্থ না করে বুঝে পড়াশুনা করতে বলতেন। বুঝে পরলে পড়ার বিষয়বস্তু দীর্ঘদিন মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়। মুখস্থ বিদ্যা পরীক্ষার ভীতিতে অনেক সময় উধাও হয়ে যায়। সন্তানদের স্বাস্থ্য সচেতন হতে পরামর্শ দিতেন। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ হতে তৈরি ভেষজ ঔষধ নিজেও ব্যবহার করতেন এবং পরিবারের সবাইকে সেবন করতে বলতেন। খাবার দাবারের ব্যাপারে কখনোই কোন উচ্চবাচ্য অথবা কোন খাবারের প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ দেখাতেন না। যাই পাতে দেওয়া হত তাই সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করতেন। নিজে পরিমিত আহার করতেন এবং পরিবারের সবাইকে সেই মত আহার করার পরামর্শ দিতেন। বলতেন আমাদের রসুল (সঃ) বলেছেন পাকস্থলীর দুই তৃতীয়াংশ খাবার ও পানি এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ খালি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সবাইকে নিয়ে মেঝেতে কিংবা খাট/চৌকিতে মাদুর এবং দস্তরখানা বিছিয়ে খেতে বসতেন। বলতেন খাওয়ার সময় কোন খাবার নষ্ট করা যাবে না। নষ্ট করা খাবারের জন্য কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে স্মরণ রাখতে বলতেন। খাবার সময় হাত ভাল করে ধুয়ে শুধু মাত্র আঙ্গুল ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবার গ্রহণ করতে বলতেন। তিনি যথেষ্টই আধুনিক মনস্ক ছিলেন। পরবর্তীতে ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারের প্রচলন শুরু হলে সাচ্ছ্যন্দেই টেবিল চেয়ারে বসে খেতেন। শরীর ও মন সুস্থ সবল রাখতে উপদেশমূলক প্রবচন গুলো

প্রায়ই বলে শোনাতেন। যেমন "After supper walk a while"" রাতের আহারের পর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে হবে। তিনি যেহেতু তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন তাই রাতে বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতেন এবং পরিবারের সবাইকে বেশি রাত পর্যন্ত না জেগে থাকতে বলতেন। এজন্য তিনি "Early to bed early to rise makes a man healthy wealthy and wise" একজন মানুষকে সুস্থ সচ্ছল এবং বিচক্ষণ হতে হলে রাতে আগে আগে ঘুমাতে যেতে হবে এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটি সবাইকে বলে শোনাতেন। ছেলেমেয়েরা যতদিন উনার নিয়ন্ত্রণে ছিল সবাইকে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে স্কুল ও কলেজের পড়াশুনায় বসতে হত এবং পরে ছেলেদের ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের জন্য উনার সঙ্গে মসজিদে যেতে হত এবং নামাজ শেষে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বাসায় ফিরতে হত।

শলা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বারোপ

ভাল অথবা মন্দ পারিবারিক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। কোন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করলে সৎভাবে জীবন যাপন করা যাবে সেই লক্ষ্যে সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী সহ সবার সঙ্গে আলোচনা করে সেই মত সৎপরামর্শ তিনি ছেলেমেয়েদের দিতেন। বড় ছেলের ছোটবেলা থেকেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিল। তিনি ১৯৬৯ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞানে সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শুধুমাত্র একজনই ছিল। নজিরউদ্দিন সাহেব খুশি হয়ে সহকর্মী শুভানুধ্যায়ীদের বাসায় চা-চক্রের দাওয়াত করলেন। ছেলে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলে ভাল হবে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ করলেন। উপস্থিত প্রায় সকলেই উনার সঙ্গে একমত হয়ে ছেলেকে ডাক্তারী পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজেও ছেলেকে বোঝালেন ডাক্তারদের সৎভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ আছে। পেশাধারী ডিগ্রী বিধায় ডাক্তারদের চাকুরী করার প্রয়োজন নাও লাগতে পারে। স্বাধীনভাবে এই পেশায় নিয়োজিত থেকে সততার সাথে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা যায়। আর রোগী চিকিৎসায় হাত যশ থাকলে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এক সময় সচ্ছলতাও আসবে। আরো বললেন সব পেশাতেই একজন মানুষ ঐকান্তিকভাবে চাইলে সৎ থাকতে পারে তবে অনেক সময় সচ্ছল নাও হতে পারে। সর্বোপরি ডাক্তারদের আর্ত-পীড়িত ও মানবতার সেবা করে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। সৎভাবে উপার্জন ও আর্ত মানবতার সেবা দুটোই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উত্তম ইবাদত।

উনসত্তর সাল পাকিস্থানের রাজনীতির এক ক্রান্তিকাল। অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার পূর্ববাংলার জনগণ দাবী আদায়ে সোচ্চার ও আন্দোলন মুখর। ঢাকা পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার কারণে সেখানকার পরিস্থিতি ভাল

নয়। মিটিং মিছিল লেগেই আছে। প্রায়ই পুলিশের গুলিতে হয় ছাত্র নয়ত আমজনতা মৃত্যু বরণ করছে। সুনামগঞ্জ থেকেও ঢাকা অনেক দূর। তখন সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকা যাতায়াতে প্রায় দুই দিন সময় লেগে যেত। সিলেট মেডিকেল কলেজের তখন বেশ সুনাম হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীর অধিকাংশই বিলেত থেকে উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত। দু-একজন শিক্ষককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তখনকার সময়ের চাহিদামত সব বিভাগই চালু আছে। হাসপাতালের বেড সংখ্যাও পর্যাপ্ত। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনের অধিক রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ভর্তি থেকে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। তাছাড়া সুনামগঞ্জের কাছাকাছি হওয়ায় তিনি নিজেও ছেলের তদারকি করতে পারবেন। দেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজই তখন সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের অধিভুক্ত। উপরোক্ত সকল মেডিকেল স্নাতকরাই পেশা জীবনে একই কেন্দ্রীয় সংস্থা মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক বিধিমালার আওতায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তিনি ছেলেকে সিলেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। অনিচ্ছা সত্তেও বড় ছেলে সিলেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যথাসময়ে ডাক্তার হন। জীবন সায়াহ্নে এসে আজ ছেলের এই উপলব্ধিটুকু হয়েছে যে তার পিতার সিদ্ধান্ত কতইনা সঠিক ছিল। অবসরে অন্যান্য পেশার আত্মীয় ও বন্ধুগণ যখন সময় কাটাতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠছেন, কেউবা মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পরছেন তখন তিনি দিব্যি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। যদিও ডাক্তারদের অবসর বলতে কিছু নেই। যত দিন আল্লাহ্‌র রহমতে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে একটা কর্মময় জীবন অতিবাহিত করা যায়। ডাক্তারদের সরকারী অথবা বেসরকারি চাকুরী থেকে অবসরের কারণে কাজের চাপ আংশিক কমলেও একটা কর্ম ব্যস্ততা থাকে। আছে মানুষের সেবা করার এবং কিছু উপার্জন করারও সুযোগ। সর্বোপরি আছে সংসারে কাজ কর্মহীন অপাংক্তেয় ব্যক্তিতে পরিণত না হওয়ার সুযোগ, যা বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তির শারীরিক বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি। পিতা মাতা সন্তানদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলই কামনা করেন। দেরীতে হলেও সন্তানদের অনেক সময় এই উপলব্ধিটা আসে।

নারী শিক্ষায়নে উদার সহযোগী

নজিরউদ্দিন সাহেব কট্টরপন্থা পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কেউ একেশ্বরবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করলে, মহান আল্লাহ্‌ ও রসুল (সঃ) নির্দেশিত সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। মনে করতেন পারিবারে ধর্ম চর্চা থাকলে এবং সবাই ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ মেনে চললে সাধারণত পরবর্তী প্রজন্মের সঠিক ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তারপরে ভবিতব্য একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকই ভাল জানেন। মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে এবং আপাদমস্তক একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হওয়া সত্বেও তিনি মেয়েদের স্কুল / কলজে পড়ার ব্যাপারে কখনো আপত্তি বা অনাগ্রহ দেখান নি। সব

সময় উৎসাহ দিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন। মেয়েদের ছোটবেলায় পড়ালেখার দেখভাল নিজেই করেছেন। আবার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে গৃহ শিক্ষক এবং টিউশন নেওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। মেয়েরা যে বিষয় নিয়ে পড়তে চেয়েছে সেই অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। কখনো ওজর আপত্তি করেন নি। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি সবাইকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতেও তাগিদ দিয়েছেন। অবসর জীবনে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে চাকরীর খোজে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতে মেয়েদের সঙ্গী থেকেছেন। তবে মেয়েদের পর্দা পুশিদা করতে এবং আল্লাহ্ ও রসুল (সঃ) নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে উপদেশ দিতেন। উনার আগ্রহের কারনে মেয়েরা সবাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং দুজন মাশাআল্লাহ এল, এল, বি ডিগ্রী অর্জন করে উকিল হয়েছে।

ধর্মচিন্তা এবং ধর্মাচার

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নজির উদ্দিন সাহেবের বিশ্বাস এবং ধারণা ছিল খুবই স্বচ্ছ। তিনি আরবী ভাষাত জানতেনই সেই সঙ্গে উর্দু এবং ফার্সি ভাষাতেও উনার ভাল দখল ছিল। এই সব ভাষায় রচিত ইসলামিক গ্রন্থ সমূহ অনেক পড়াশুনা করেছেন। সেজন্য হক্কানি আলেম উলামাদের সর্বজন স্বীকৃত কোরআনের তফসির-কৃত সঠিক ব্যাখ্যা এবং রসূলে পাক (সঃ) এর জীবন ও আমলের প্রতিফলন সহি হাদিস অনুযায়ী পরিচালিত পথকেই উত্তম ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা, এই বিশ্বাস মনেপ্রাণে বিনীত ভাবে ধারণ করতেন। তাই অন্য কারো কোরআনের এই শাশ্বত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে নিজের মত করে ব্যাখ্যা প্রদান ও নতুন নতুন বিধান সংযোজনকে মুসলমানদের আকিদার উপর আঘাত মনে করতেন এবং এদেরই ইসলামের নামে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অপছন্দ করতেন। এই ধরনের রাজনীতি শুধুই ধর্মকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী স্বার্থে ক্ষমতা-রোহণের রাজনীতি। এতে ইসলাম ধর্মের কোন আদর্শগত আয় বৃদ্ধি হবে না। তাই তিনি এদের ব্যাপারে সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন ধরণের বিদ'আতকে ইসলামের পালনীয় অংশে পরিণত করা এবং কোরআন ও সন্নাহর ভ্রান্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসাবেও তিনি মনে করতেন। বলতেন আমাদের রসূল (সঃ) সব সময় সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে আলোচনা করে সঙ্কট থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিতেন। যা বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। নজির উদ্দিন সাহেব মনে করতেন একটি দেশের অধিকাংশ মুসলমান যখন মনে প্রাণে দৈনন্দিন সব কর্মকাণ্ডে ইসলামের রীতি নীতি মেনে চলবে এবং ইসলামি বিধানকে শ্রেষ্ঠতর জীবন ব্যবস্থা মনে করবে তখন এমনিতেই শরিয়ত ভিত্তিক ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মকর্মে জোর জবরদস্তির কোন প্রয়োজন হবে না।

ব্যক্তি জীবনে তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। কোরআন ও সন্নাহর আলোকে তথা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ও নবিজী মুহাম্মদ (সঃ) এর নির্দেশিত পথে জীবনকে চালিত করার চেষ্টা করেতেণ। রাতের শেষদিকে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন এবং ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন। ফজরের নামাজ শেষে বাসায় ফিরে পবিত্র কুরআন তেলাওত করার পর দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করতেন। কর্ম দিবসে কলেজে থাকলে যোহর এবং আছর নামাজ ওখানেই আদায় করতেন। মাগরিব এবং এশার নামাজও জামাতে আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন। বন্ধের দিন এবং অবসরের পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই তিনি মসজিদে জামাতে আদায় করতেন। অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী না হলে আমৃত্যু তিনি এই নিয়ম নিত্যদিন মেনে চলেছেন। তিনি দিল্লীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মওলানা ইলিয়াস (র:) এর একজন ভক্ত, অনুরক্ত অনুসারী ছিলেন। তার প্রচারিত তবলীগ জামাতের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব বলতেন আমরা নিজেদের মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিই কিন্তু সঠিকভাবে কলেমা বলতে পারিনা। শুদ্ধ-ভাবে নামাজ আদায় করতে পারিনা। সবাইত আর মাদ্রাসা বা মক্তবে পড়েন নি বা পরিণত বয়সে পড়া সম্ভবও নয়। বাড়ীতেও হয়ত কেউ কোন কারণে আমাদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় রীতিনীতি সব সঠিকভাবে আত্মস্থ করেন নি। মুসলমানদের মধ্যে তবলীগের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য হল অবশ্য পালনীয় আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যগুলো সঠিক ও শুদ্ধ ভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা অন্য মুসল্লিদের থেকে যাচাই করে নেয়া এবং নিজেদের ভুলক্রটি গুলো শুধরানোর চেষ্টা করা। কারণ তবলীগ জামাতে অনেকেই থাকেন যারা এ বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে পারেন।

সুনামগঞ্জে গুটিকতেক মুসল্লি নিয়ে তিনি তবলীগ জামাতের যাত্রা শুরু করেন। প্রথমে অনেকেই এর সমালোচনা করতেন। পরে আস্তে আস্তে এর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবলীগ জামাতের অনেকগুলো সুন্দর কাজের কিছু হল ধনী গরিব শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই লাইন ধরে রাস্তার একপাশ দিয়ে পায়ে হেটে গাশত বা দাওয়াতের জন্য বের হওয়া। মুসল্লিগেণর সবার যার যার সাধ্যমত খাবার আয়োজনে অংশ গ্রহণ করা। ভেদাভেদ ভুলে একই দস্তরখানায় বসে খাদ্য গ্রহণ করা। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই মুসলমানরা একে অপরের ভাই ভাই ইসলামের এই মূল শিক্ষাই যেন মূর্ত হয়ে উঠে তবলীগের মুসল্লিদের মধ্যে। মুসল্লিরা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের অজানা ধর্মা-চারের বিভিন্ন নিয়ম কানুন একে অপরের কাছ থেকে জেনে নেন। অনেকেই তবলীগের মুসল্লিদের সংস্পর্শে এসে আমূল পরিবর্তিত একজন খাটি ধর্মপ্রাণ মানুষে রুপান্তরিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তবলীগ জামাতে অনেক জ্ঞানী গুণী ও ইসলামের হুকুম আহকামের নিয়মিত আমলদার আবার আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নেন। এদের নিবেদিত আমল আখলাকের কারনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মহাত্মাদের

দোয়াও কবুল করেন। নজিরউদ্দিন সাহেবের ছোট ছেলের ঘুমের মধ্যে খিঁচুনি হত। অনেক চিকিৎসা, তাবিজ কবজে এর কোন প্রতিকার হচ্ছিল না। সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান তবলীগ জামাতের আমির ছিলেন একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার। নাম ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকিত সাহেব। অত্যন্ত কামেল ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিনি চিল্লার অংশ হিসাবে সুনামগঞ্জে এলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব তখন সুনামগঞ্জ তবলীগ জামাতের আমীর। চীফ ইঞ্জিনিয়ার মুকিত সাহেব সকালের নাশতার দাওয়াতে বাসায় এলে নজির উদ্দিন সাহেব ছেলের সমস্যার কথা তাকে জানালেন। তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম পড়ে দোয়া করলেন এবং ছেলের শরীরে ফুকে দিলেন। সেই থেকে ছেলের খিঁচুনি আজ পর্যন্ত আর হয়নি।

তবলীগের অনেক অশিক্ষিত গ্রামের সাধারণ লোকজন নজিরউদ্দিন সাহেবের বাসায় আসতেন, তাদের সঙ্গে নজিরউদ্দিন সাহেব আপন মানুষের মত ব্যবহার করতেন। হবিগঞ্জের বাসায়ও তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ী উজিরপুর থেকে অনেক সাধারণ মানুষ আসতেন, তাদের কখনই অবহেলা করতেন না। বয়সে ছোট হলেও তুমি না বলে আপনি সম্বোধন করতেন। তাদের বসাতেন ও আপ্যায়ন করতেন এবং উনার সীমিত আয়ের মধ্যে থেকেও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য সহায়তা করতেন। তিনি পরিচিত অপরিচিত মুরুব্বীদের সাথে সব সময় শ্রদ্ধা ভরে কথা বলতেন। বর্তমানে তবলীগ জামাতের কর্ম পরিধি আরো অনেক বিস্তৃত হয়েছে। দেশে বিদেশে এখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নির্দেশিত ইসলামের সুশীতল সঠিক পথে আসার আহ্বান করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপ আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক লোক আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। পরকালে মুক্তির জন্য সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত পথ খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের মহান ধর্ম ইসলামের জয়গান সাড়া বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তবলীগ জামাতের এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

অনুকরণীয় অসাম্প্রদায়িক শোভন শিষ্টাচার

নজিরউদ্দিন সাহেবের কাছে ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত কোন ভেদাভেদ ছিল না। কেউকে গালি-গালাজ করাত দূরের কথা কখনো কটু কথা বলতে শুনা যায়নি। অন্যের সমালোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন। কর্ম ক্ষেত্রে অনেকের সাথে মতের ভিন্নতা ছিল তবে তা কখনই ব্যক্তিগত রেষারেষির পর্যায়ে নেননি। সুনামগঞ্জে ইসলাম ধর্মের ভিন্ন মতাদর্শের সমর্থকদের সাথে কখনো কখনো ইসলাম ধর্মের তত্ত্বগত ও আকিদা বিষয়ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। তবে সেটা ছিল সাময়িক। পরে আবার তাদের সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করেছেন। তিনি আধুনিক চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে ছিলেন না। অতি আধুনিকতার নামে অনাচার এবং আমাদের ধর্মীয় অনুভূতির বিপরীতমুখী কোন রীতি নীতি অপছন্দ করতেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলতেন।

আচার আচরণে সব সময় ফর্মাল থাকার চেষ্টা করেছেন। একবার সিলেটে উনার ভাতিজার বিয়েতে সেই রকম আচরণই লক্ষ্য করা যায়। বর বন্ধুদের সঙ্গে একটি কক্ষে হাসি তামাশা আলাপচারিতায় ব্যস্ত আছেন। নজিরউদ্দিন সাহেবের ভাতিজাকে দরকারী কোন কাজে প্রয়োজন। তিনি সরাসরি ওই কক্ষে প্রবেশ না করে দরজায় কড়া নেড়ে অনুমতি চাইলেন এবং কিছু সময় পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। ভাতিজার বন্ধুরা কেউ কেউ উনাকে চিনতেন। বেশভূষায় মৌলভী কিন্তু আচার আচরণে খুবই ফর্মাল, সবাইকে বিস্মিত করল। নজিরউদ্দিন সাহেব কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর সবাই উনার এই উন্নত আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সিলেট মেডিকেল কলেজ হোস্টেলেও মাঝেমধ্যে বড় ছেলেকে দেখতে আসতেন। সেখানেও ছেলের বন্ধু সহপাঠীদের সঙ্গে সাবলীল ভাবে মেলামেশা এবং গল্পগুজব করেছেন। সুনামগঞ্জ শহরে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে উনার সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। সবার সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে উঠা বসা করেছেন। তিনি নিজ ধর্মমতের মানুষের সাথে যেরকম সাবলীল ও সৌহার্দপূর্ণ মন নিয়ে মিশতেন ঠিক তেমনি ভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সর্ব স্তরের মানুষের সঙ্গেও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে কেউকেই কখনই ব্যক্তি জীবনে অথবা কর্মক্ষেত্রে অবহেলা করেন নি। সুনামগঞ্জ শহরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অনেকেই উনার বন্ধুসম ছিলেন। সবার সঙ্গে উনার সুসম্পর্ক ছিল। সবাই উনাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। কারো বিরাগ ভাজন ছিলেন না এবং কেউ কখনো উনার বিরূপ সমালোচনা করতে শুনা যায়নি।

সংসার জীবনের ঘোরপ্যাঁচ

তিনি অতিশয় সহজ সরল মানুষ ছিলেন। সংসার জীবনের ঘোরপ্যাঁচ তিনি বুঝতেন না অথবা বুঝলেও এড়িয়ে চলতেন। নিজে সৎ ছিলেন তাই অন্যকেও সৎ ভাবতেন এবং বিশ্বাস করতেন। এজন্যে উনাকে অনেক সময় ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে। সুনামগঞ্জে তিনি হাছননগর এলাকায় ভাড়া করা বাসায় পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতেন। এই বাসাটি হিন্দু যৌথ মালিকানার সম্পত্তি ছিল। এদের কেউ কেউ ভারতে চলে গিয়েছিলেন শুধু একজন দেশে ছিলেন যিনি মাঝে মধ্যে এসে ভাড়া আদায় করতেন। বাড়ীটি তাই শত্রু সম্পত্তি হিসাবেও তালিকাভুক্ত ছিল। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকালীন সময় হতে হিন্দু মালিকানার সম্পত্তি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা ছিল। দেশে থাকা মালিক পক্ষের হিন্দু ভদ্রলোক নজিরউদ্দিন সাহেবকে বাসাটি ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু ঝামেলা পোহাতে হবে তাই তিনি আগ্রহ দেখান নি। পরে শহরের অন্য এক ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে রেজিস্ট্রি দলিল মূলে বাসাটি ক্রয় করে ফেলেন। নতুন ক্রেতা নজিরউদ্দিন সাহেবের সাথে ক্রয়ের আগে কিংবা পরে কোন প্রকার যোগাযোগ করেন নি। নিজেকে প্রভাবশালীদের আত্মীয় মনে করায় তিনি ভেবেছিলেন যেকোন সময় নজিরউদ্দিন সাহেবকে উৎখাত করে বাসাটি দখলে নিতে পারবেন।

একদিন সুযোগ মত রাতের বেলায় নজিরউদ্দিন সাহেবের অনুপস্থিতিতে ওই ভদ্রলোক লোকজন নিয়ে বাসার একাংশ দখল করতে এলেন। লোকজনের হৈচৈ এবং খবর পেয়ে ওই পাড়ায় বসবাসরত মহকুমা সেকেন্ড অফিসার (ম্যাজিস্ট্রেট) নতুন খরিদ্দার সাহেবকে দলবল সহ জোরপূর্বক অন্যের বাসায় ঢোকার অপরাধে মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন। অবশ্য দুই তিন পরে তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন।

এর কিছুদিনের ব্যবধানে নজিরউদ্দিন সাহেবের ভাড়া বাসায় আগুন লেগে যায়। আগুন মূল ঘড়ে না লেগে লাগোয়া পিছনের ঘড়ে লেগেছিল তাই রক্ষা। পাড়া প্রতিবেশী এবং নিকটবর্তী কলেজ মুসলিম হোস্টেলের ছাত্রসহ সমবেত জনতা সবাই মিলে সেদিন রাতে আগুন নির্বাপণে সহায়তা করায় শুধুমাত্র পিছনের ঘড়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। পরের দিন শহরের অনেকেই সহানুভূতি জানাতে আসেন। বাসার নতুন ক্রেতার দিকে আঙ্গুলি তুলে তাঁকে আসামি করে ফৌজদারি মামলা দিতে বলেন। কিন্তু তিনি রাজী হন নি। বললেন আমি যেহেতু আগুন দিতে স্বচক্ষে দেখিনি তাই আন্দাজে ভর করে কেউকেই আসামী করে কোন মামলা দেব না। কলেজের ছাত্ররাও ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওই ভদ্রলোককে একহাত নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বারণ করেন। নজিরউদ্দিন সাহেব বললেন কেউ অপরাধ করে থাকলে আল্লাহ্ তার বিচার করবেন। একজন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ আল্লাহ্ ভীরু মানুষের পক্ষেই প্রতিহিংসা পরায়ণতা পরিহার করে এই ধরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন কড়া সম্ভব। পরবর্তীতে স্থানীয় আইনজীবী এবং শুভানুধ্যায়ীগণ পরামর্শ দিলেন বাড়ীটির মালিকানা অনুকূলে আনতে হলে একই মালিকানার প্রতিবেশীকে দিয়ে সিলেটে প্রি-এমসন সিভিল মামালা করতে হবে। কারন প্রতিবেশীর ও উনার বাসায় প্রবেশের রাস্তা ও পুকুর যৌথ মালিকানায় ছিল। যথাসময়ে উনার আর্থিক আনুকূল্যে এবং উদ্যোগে প্রতিবেশীকে বাসাটির অর্ধেক মালিকানা হস্তান্তরের শর্তে মামলা করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে মামলার রায় অনুকূলে হয়। কিন্তু ঝামেলা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না। অবশেষে সুনামগঞ্জের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী জননেতা মরহুম হেসেন বখত সাহেবের হস্তক্ষেপে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। আর এর ফলে একজন আল্লাহ্ ভক্ত-অনুরক্ত সহজ সরল মানুষ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পান।

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হোসেন বখত সাহেব

জনাব হোসেন বখত সাহেব সম্বন্ধে কিছু না লিখলে বাঙ্গালী জাতির ক্রান্তিকালীন সময় উনসত্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপর-বর্তী সময়ে সুনামগঞ্জ এলাকার রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ একজন ত্যাগী মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ থেকে যাবে। সুনামগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে আরপিননগরে প্রভাবশালী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। লক্ষনশ্রীর জমিদার মরমী কবি দেওয়ান হাছান রাজার সাথে

বৈবাহিক সুত্রে এই পরিবারের আত্মীয়তা আছে। তখনকার সময়ে সুনামগঞ্জ শহরে হোসেন বখত সাহেব খুবই সাহসী, বিচক্ষন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা না থাকলেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। উপস্থিত সমস্যা সমাধানের জন্য সবার কাছে তিনি সমাদৃত ছিলেন। শহরের সবাই উনাকে সমীহ ও মান্য করে চলত। সুবিচারক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। সালিশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় উনার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ব্যবসা করতেন। বাজারে বেশ চালু অবস্থার একটি ষ্টেশনারী ও প্রসাধনীর দোকান ছিল। কর্মচারীরা দোকান চালাত। মাঝে মধ্যে তিনি নিজেও দোকানে বসতেন। নজিরউদ্দিন সাহেব কোন কাজে বাজারের দিকে গেলে এবং হোসেন বখত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলে চা নাস্তা আপ্যায়ন না করিয়ে ছাড়তেন না।

জনাব হোসেন বখত সাহেব সুনামগঞ্জ আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতাদের অন্যতম ছিলেন। সত্তরের দশকের শেষ দিকে যে কয়জন মুষ্টিমেয় নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাংগঠনিক তৎপরতায় ধীরে ধীরে সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের অবস্থান দৃঢ় হতে থাকে তিনি এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। তিনি কখনো নির্বাচন করেন নি। কিন্তু নির্বাচনে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালনকারী ছিলেন। সত্তর সালের নির্বাচনে জনাব হোসেন বখত সাহেবের উদ্যোগে এবং পরামর্শে সুনামগঞ্জ সদর আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরী সাহেবকে প্রার্থী করা হয়। দেওয়ান সাহেবের ব্যক্তি ইমেজ জনসাধারণের কাছে খুবই ভাল এবং গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাহমুদ আলী সাহেবকে ঠেকাতে হলে তাঁর নিকট আত্মীয় দেওয়ান সাহেবই উপযুক্ত প্রার্থী। সেই সময়ের গণজোয়ার এবং প্রার্থীর ব্যক্তি ইমেজ এই দুইয়ের মিশ্রণে দেওয়ান সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন। প্রতিপক্ষ পি, ডি, পি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী মাহমুদ আলী সাহেব ভোট যুদ্ধে এতটাই ধরাশায়ী হন যে উনার জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। সেই নির্বাচনে সর্বত্রই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত প্রার্থীদের অভূতপূর্ব বিজয় সাধিত হয়। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে সর্বত্রই সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনে সুনামগঞ্জে হোসেন বখত সাহেব সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই নেতৃত্বে ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্থানের সামরিক জান্তা সহজে সংখ্যা গরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তখন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের নির্দেশের আলোকে পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত সুনামগঞ্জেও হোসেন বখত সাহেবসহ এলাকার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগী তরুণ ছাত্রজনতার সমন্বয়ে এই প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং সময়মত প্রশাসনের সহযোগিতায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের সুযোগ রেখে এই প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি রাখা হয়। সুনামগঞ্জ শহরে সংঘটিত প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধটি এই বাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের কারণে বিজয় লাভ করে। পরাজিত হয় উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অধুনিক

সামরিক সরঞ্জামে সমৃদ্ধ এক প্লাটুন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। প্রতিরোধ যুদ্ধের পরপরই শুরু হল স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তর সালে সেই মরণপণ যুদ্ধকালীন সময়ে সুনামগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন ভাটি এলাকার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন জনাব হোসেন বখত সাহেব।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও তিনি সুনামগঞ্জের আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষায় ও অরাজকতা বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা রাখেন। বাইরে থেকে বুঝা না গেলেও যতটুকু জানা যায় তিনি তখনকার সময়ের দুরারোগ্য ব্যাধি পাকস্থলীর আলসারে ভুগছিলেন যা একসময় পাকস্থলী ফুটো করে সমস্ত পেটে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থার অবনতি ঘটায়। উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হলেও দেরী হয়ে যাওয়ার কারণে উনাকে আর বাঁচান সম্ভব হয়নি। নিতান্তই অল্প হয়তবা পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে একজন সম্ভাবনাময় জননেতার জীবনাবসান ঘটে। আজকাল পাকস্থলীর আলসারের অনেক উন্নত চিকিৎসা বেরিয়েছে তাই পাকস্থলী ফুটো হওয়ার মত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এখন আর তেমন একটা ঘটে না। বিদ্যুৎ গতিতে উনার মৃত্যু সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে সবাই শোকে মুহ্যমান। খবর পাওয়া গেল প্রিয় নেতার লাশ নিয়ে হেলিকপ্টার সুনামগঞ্জ আসছে। হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ উনাকে দেখার জন্য এবং শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সমবেত হলেন। এরকম অভূতপূর্ব দৃশ্য সুনামগঞ্জে এর আগে কখনো ঘটেনি। উনার সাহসী ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি মানুষের মনে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার স্থান গড়ে নিয়েছিলেন। সুনামগঞ্জ-বাসী তাদের প্রিয় নেতাকে পরম শ্রদ্ধায় অশ্রু ভেজা চোখে শেষ বিদায় জানিয়ে চির নিদ্রায় শায়িত করলেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হোসেন বখত সাহেবের সব ভাল কাজগুলো আমলে নিয়ে উনাকে বেহেশত নসীব করুন। হোসেন বখত সাহেব কখনো কোন পদ পদবীর জন্য লালায়িত ছিলেন না বা এসবের জন্য চেষ্টা তদবিরও করেন নি। উনার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিপুল জনপ্রিয়তা উত্তরসূরিদের জন্য পাথেয় হয়ে আছে বললে হয়ত অত্যুক্তি হবেনা। উনার সুযোগ্য পুত্র মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ার বখত নেক সুনামগঞ্জ পৌরসভার একজন সফল চেয়ারম্যান ছিলেন। অনেক ভাল কাজের জন্য তিনিও সুনামগঞ্জ বাসীর অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনিও পিতার ন্যায় অপরিণত বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। সুনামগঞ্জ পৌরসভার আরো একজন উন্নয়ন প্রয়াসী এবং সফল চেয়ারম্যান ছিলেন মরমী কবি হাছন রাজার প্রপৌত্র দেওয়ান মোমিনুল মৌজদীন। সুরুচিকর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ভাবুক ও কবি মোমিনুল মৌজদীন এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। বর্তমানে সুনামগঞ্জ পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। সুনামগঞ্জবাসীর ভালবাসা ও আস্থা নিয়ে এখন কর্পোরেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হোসেন বখত সাহেবের আরেক ছেলে আইয়ুব বখত জগলুল। যতটুকু জানা যায় সুনামগঞ্জ শহরের বহুবিধ উন্নয়ন ইতিমধ্যে তিনি করেছেন। তিনি সৎ এবং সজ্জন লোক। আমরা যারা ভোটার তাদের উচিত হবে এধরণের যোগ্য লোকের হাতকে আর শক্তিশালী করা।

বাঙালীর ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপট

পাকিস্থান নামক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। বাঙালীদের উপর প্রথম আঘাত আসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর প্রতি কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণীর অসহনশীল ও অনমনীয় মনোভাবের কারণে। এছাড়া পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাঙালীদের অবস্থান ছিল একেবারেই গৌণ। সিভিল সার্ভিস, পি, আই, এ, রেলওয়ে সহ বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবাই ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী মোহাজের নয়ত পশ্চিম পাকিস্থানের পাঞ্জাবের বাসিন্দা। যদিও এই উভয় দলই ব্রিটিশ আমল থেকেই আধুনিক শিক্ষা এবং অর্থ বিত্তে তুলনামূলক ভাবে অধিকতর অগ্রসরমান ছিল এবং সেই সময় থেকেই সামরিক বাহিনীতে তাদের অংশগ্রহণও ব্যাপক ছিল। পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও তাদের এই ধারা অব্যাহত থাকে। যদিও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেরও আধুনিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য রকম অগ্রগতি হয়েছে এবং তাঁরা ঊর্ধ্বতন পদ পদবীর উপযুক্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি এবং বৈরী মনোভাবাপন্ন পরিবেশের কারণে বাঙালীদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। অনেক যোগ্যতম বাঙালী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে একটি পর্যায়ের পর উপরে উঠতে দেয়া হত না। এতে মধ্যবিত্ত বাঙালী মন মানসে ক্ষোভ সৃষ্ট হতে থাকে। একই দেশের বাসিন্দা হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানিরা কর্মক্ষেত্র হোক আর শিক্ষাঙ্গনে হোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নাসিক মনোভাবাপন্ন ছিল। তারা কখনই আন্তরিকভাবে বাঙালীদের সাথে মেলামেশা করত না। তাঁরা যদিও খুব যে ধার্মিক ছিল তা নয় তারপরেও নিজেদের বাঙালিদের থেকে উন্নততর মুসলমান ভাবত। সব কিছুতেই পশ্চিমারা তাদের প্রাধান্য বজায় রেখে চলত এবং বাঙালীদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত আচরণ করত। ফলে ক্ষুব্ধ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে।

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতিও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক বেশী বৈষম্যমূলক ও শ্লথ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নামে বাজেটের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হত। পশ্চিম পাকিস্তানের পুরাতন শহরগুলোর আধুনিকায়ন ও চাকচিক্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আরো নুতন নুতন শহর গড়ে তুলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য এবং পূর্ব পাকিস্থানে অধিষ্ঠিত পদলেহী চাটুকার সরকারগুলোর কারণে এই অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে আস্তে আস্তে আরো অবনতি হতে থাকে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের চাটুকার সরকারগুলো বরাদ্দকৃত অপর্যাপ্ত বাজেট পুরোটা ব্যয় না করে বাহবা নেওয়ার জন্য কিছুটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিত। অধিকার ও রাজনীতি সচেতন পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ এই ব্যাপারে ঘরোয়া আলোচনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্থানের সচেতন বাঙালী

রাজনীতিবিদ এবং ছাত্র সামাজও এই পরিপ্রেক্ষিতে বসে ছিলেন না। বাম সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ সহ একই ভাবধারার ছাত্র নেতারা বিভিন্ন সভা সমাবেশে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের বৈষম্যমূলক বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে থাকেন। মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আলোচনা এবং নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতি সাড়া পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার জনগণের আর বুঝতে বাকী রইলনা ধর্মীয় অনুভূতির ভিত্তিতে সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতার আড়ালে তারা পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণ ভিতরে ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। শুধু প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ ও আস্থাশীল নেতৃত্তের। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ওই ধারাবাহিক আন্দোলনে মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অনেক বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ছাত্র নেতারা তখনকার পাকিস্থান সরকারের কোপানলে পড়ে জেল, জুলুম সহ নানা নিপীড়ন অত্যাচার সহ্য করেছেন। নিপীড়িত মানুষ তথা বাঙালীর অধিকারের কথা বলে বলে বঙ্গবন্ধু জীবনের অনেকটা সময় পাকিস্থানের কারাগারগুলোতে কাটিয়েছেন। তবে সেই সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গন অনেকটাই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। ভিন্ন মতাদর্শী রাজনীতিবিদেরা একে অপরের সুহৃদই ছিলেন কখনো শত্রু মনো-ভাবাপন্ন ছিলেন না। পারিবারিক ভাবেও তাঁরা নানাভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।

বর্তমান সময়ের কুলষিত ভঙ্গুর রাজনীতি

তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই সময়ের রাজনীতি এখনকার মত এতটা জটিল ও কূলষিত ছিল না। পাকিস্থান আমলে রাজনীতি যতই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও কোন্দল নির্ভর থাকুক না কেন রাজনীতিবিদেরা প্রতিপক্ষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। পারিবারিক ভাবেও তারা একে অপরের সাথে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতেন। রাজনীতি তখন এখনকার মত বিনা পূজিতে লাভজনক অর্থকড়ি কোন পেশা ছিল না। তখন যারা রাজনীতি করতেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র পেশায় নিয়োজিত থাকতেন। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তারা জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিবেদিত থেকে কাজ করতেন। নগদ অর্থকড়ির লাভের আশায় এখন রাজনীতিতে আসক্তি তাই দিনদিন বেড়েই চলেছে। সাথে যোগ হয়েছে দূর্বৃত্তায়ন। অনেক ক্ষেত্রেই এখন প্রতিপক্ষের সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধ শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পরিণত হয়েছে। এজন্যে রাজনীতিতে আজ এত হানাহানি খুনাখুনি। প্রতিপক্ষকে হত্যা গুম সহ নানাভাবে নাজেহাল করা হচ্ছে। এমনকি নিজ দলীয় কোন্দলের জেরে অনেক প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল নেতা কর্মী হতাহত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাল এবং মেধাবী লোক রাজনীতিবিমুখ হয়ে পরছেন। এভাবে চলতে থাকলে এদেশে রাজনৈতিক দলগুলো একসময় হয়ত মেধাশুন্য দুর্বৃত্ত নির্ভর ক্লাবে পরিণত হবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আরেক অর্বাচীন জেনারেল

মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক উদ্ভট ব্যবস্থা চালু করে জেনারেল আইয়ুব খান সাহেব সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নির্বিঘ্নে দশ বছর পাকিস্থান শাসন করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্থানের সাধারণ জনগণ একসময় তাঁর অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। অবশেষে উনসত্তর সালে সাড়া পাকিস্থান ব্যাপি গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি তার উত্তরসূরি হিসাবে তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে পাকিস্তানকে সমূহ ক্ষতির মুখে ঠেলে দেন। নতুন জেনেরাল সাহেব মার্শাল-ল জারী করেন এবং অতিসত্বর নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। তিনি আরো ওয়াদা করলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং দায়িত্ব পালন শেষে ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। বরঞ্চ পরবর্তীতে এই নির্বোধ জেনারেলের দাম্ভিকতা এবং অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারনে পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশের কবর রচিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী ও সত্তরের নির্বাচন

দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার বাঙালি ততদিনে পাকিস্তানি শাসক গুষ্ঠি ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ। এটাও আমলে নিতে হবে যে পূর্ববাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির কারনে একটি শক্তিশালী অধিকার সচেতন আত্মমর্য্যাদাশীল শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে যারা পরবর্তীতে বাঙালীর বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেন। এরাই বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। বাঙালীর এই অধিকার সচেতনতা ও জাত্যভিমান তৈরিতে বাম গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবদানও কোন অংশেই খাটো করার মত ছিল না। কিন্তু তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক ছয় দফা বাংলার সকল স্তরের মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। বাংলার জনগণ বুঝতে পারে ছয় দফাই মুক্তির একমাত্র সনদ। তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বাংলায় গণ মানুষের দলে পরিণত হয়। সাড়া পূর্ব-বাংলার শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে তিনি ব্যাপক গণসংযোগ এবং সভা সমাবেশের আয়োজন করেন। প্রতিটি সভা সমাবেশ জন সমুদ্রে পরিণত হতে থাকে। তিনিও উদাত্ত কণ্ঠে নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছিলেন আমি আপনাদের বঞ্চনা গঞ্জনার অবসান করে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্। উক্ত সভা সমাবেশগুলোতে অধিক সংখ্যায় জনসাধারণ উপস্থিত হয়ে তার রাজনৈতিক কর্মপন্থার প্রতি বিপুল সমর্থন জানাতে থাকে। এই বিশাল জনসমর্থন তাকে পূর্ব-বাংলার অধিকার বঞ্চিত জনগণের

অবিসংবাদিত নেতা এবং ত্রাতায় পরিণত করে। তিনি সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানালেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী যদি কলাগাছও হয় আপনারা তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আমি এদেরকে নিয়েই আপনাদের অধিকার আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

অধিকার বঞ্চিত জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর এই আহ্বানের প্রতি সায় দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে সত্তরের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সাড়া পাকিস্থানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। সেই নির্বাচনে সুনামগঞ্জের জনগণও আওয়ামী লীগের পতাকা তলে একত্রিত হয়েছিল। আর সেজন্যেই-ত পাকিস্থানের ডানপন্থী রাজনীতির একজন ডাকসাইটে নেতা সুনামগঞ্জ সদর আসন থেকে শুধু পরাজিতই হন নি তার জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এই নেতা সুনামগঞ্জে নির্বাচন পূর্ববর্তী এক সমাবেশে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বদলে উক্ত আসনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ভোট যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তার প্রতি জামানত বাজেয়াপ্তের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিয়তি ওই নেতাকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছিল। তার শুধু জামানতই বাজেয়াপ্ত হয়নি চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে তিনি সবচাইতে কম ভোট প্রাপ্ত হন। সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য এই নেতা যাদের জনসম্পৃক্ততা এবং জনকল্যাণের রাজনীতির গৌরবময় সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং যিনি যুবা বয়সে নিজেও বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তখন বাংলার জনগণ তথা নিজের ভোটারদের নাড়ী বুঝতে সমর্থ হন নি। একদেশদর্শী জনসম্পৃক্ততাহীন এই রাজনৈতিক নেতারা বাঙ্গালী হলেও পাকিস্থানের প্রাসাদ রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। ইতিহাস এদেরকে আজ আস্তা-কুরে নিক্ষেপ করেছে।

জাতীয় পরিষদ সদস্য দেওয়ান সাহেব

সত্তরের নির্বাচনে সুনামগঞ্জ সদর আসনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরী সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তিনি দেওয়ান সাহেব নামে সর্বাধিক পরিচিত। উনার সম্বন্ধে কিছু না লিখলে একাত্তর সালে বাঙালী জাতির ক্রান্তিকালীন সময়ে সুনামগঞ্জে নেতৃত্ব দানকারী জনপ্রিয় একজন নেতার অবদান এবং সঙ্গে সুনামগঞ্জবাসীর গৌরবময় প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব-গাথার ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। দেওয়ান সাহেব সুনামগঞ্জ শহরের একজন শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুনামগঞ্জের শহরের দুটি বহুল পরিচিত প্রভাবশালী এবং রাজনীতি সচেতন পরিবারের সাথে তিনি জন্মসূত্রে সম্পর্কিত। পিতৃকূলের দিক থেকে তিনি শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত লক্ষনশ্রীর জমিদার স্বনামধন্য মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার চৌধুরীর পৌত্র। পিতা দেওয়ান হাছিনূর রাজা চৌধুরী, দেওয়ান হাছন রাজার দ্বিতীয় পুত্র এবং খানবাহাদুর দেওয়ান গনিউর রাজার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাতৃকূলের দিক থেকে তিনি সুনামগঞ্জ শহরের

আলীমাবাগের উচ্চ শিক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ আলী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। দেওয়ান সাহেব তাই নামের অগ্রভাগে এইচ, এম ব্যবহার করতেন। এইচ দিয়ে দাদা হাছন রাজা এবং এম অক্ষর নানা মোশাররফ আলী সাহেবের নামের অদ্যাক্ষর বুঝাত। মাতামহ জনাব মোশাররফ আলী সাহেব সুনামগঞ্জে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। মাতুলদের কয়েকজন স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রসঙ্গান্তরে তাদের সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। দেওয়ান সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মামা মসদ্দর আলী সাহেবের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে মাতুলদের সাথে সম্পর্ক আরো নিবিড় করেন। হাছন রাজার পরিবারে সম্ভবত তিনিই প্রথম উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি সুনামগঞ্জ গভর্নমেন্ট জুবিলী হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। হাই স্কুলে পড়ার সময় লেখাপড়ার সুবিধার্থে পিতা হাসিনুর রাজা লক্ষণশ্রী থেকে সুনামগঞ্জ শহরের দেওয়ান সাহেবের মাতুলালয় আলিমাবাগ সংলগ্ন দক্ষিণ অংশ হাছননগরে বসতবাটি স্থানান্তর করেন। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বিশাল এই বাড়ীটি বর্তমানে দেওয়ান বাড়ী নামে পরিচিত। লেখাপড়ার প্রতি উনার আগ্রহ এবং শিক্ষানুরাগী মামাদের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় দেওয়ান সাহেব গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও পিতার অসুস্থতার কারনে মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারেন নি।

দেওয়ান সাহেব বিত্তশালী জমিদার পুত্র হলেও তাঁর পিতার অমিতব্যয়ী জীবন যাপনের কারণে জীবন সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে কঠিন সময় পেড়িয়ে আসতে হয়েছে। তদীয় পুত্র দেওয়ান মুসাদ্দেক রাজার ভাষ্য মতে হাসিনুর রাজা সাহেব ঋণের দায়ে আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি সুনামগঞ্জ শহরের হাছন নগরের বসতবাটিটি ব্যতীত অধিকাংশ সহায় সম্পত্তি বন্ধকী রেখে যান। মোসাদ্দেক রাজা আরো জানিয়েছেন তাঁর পিতা সৌভাগ্যবানও ছিলেন। জন্ম সুত্রে একক উত্তরাধিকারী হিসাবে পিতার সমূদয় সম্পত্তির মালিকানা তিনি মায়ের কাবিনের শর্ত মতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। চল্লিশ পেরোনো এবং বহু বিবাহে অভ্যস্ত দেওয়ান হাসিনুর রাজা কাবিননামায় তদীয় সমূদয় সম্পত্তি কনেকে দান করার শর্তে আলিমাবাগের আইনজ্ঞ ভ্রাতাদের বোনকে বিবাহ করেন। এতে হসিনুর রাজা সাহেবের অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা বঞ্চিত হয়েছেন। জনাব মসদ্দর আলী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নিজ অধিকাংশ সম্পত্তি একমাত্র কন্যাকে দান করে যাওয়ায় এবং দেওয়ান সাহেব উক্ত কন্যাকে বিয়ে করায় বাড়তি আরো সহায় সম্পদ তাঁর পরিবারে যোগ হয়। গ্রাজুয়েশন শেষে অন্য কোন চাকুরীর সন্ধান না করে মামা আসাম সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী জনাব মুনাওওর আলী সাহেবের পরামর্শক্রমে বেদখল হয়ে যাওয়া নিজ পিতা এবং পিতৃব্য খান বাহাদুর গনিউর রাজা সাহেবের সহায় সম্পত্তি কোর্টস অফ ওয়ার্ডসের কাছে হস্তান্তর করেন এবং কিছু সম্মানীর বিনিময়ে তিনি এর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই প্রক্রিয়ার ফলে বেহাত হয়ে যাওয়া পৈতৃক সম্পত্তি আস্তে আস্তে উনার দখলে আসতে থাকে। তবে এর জন্য তাকে অনেক মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে হয়। পারিবারিক সুত্রে জানা যায় এমনকি লক্ষনশ্রীর বসতবাটির পৈতৃক অংশটি ফিরে পেতেও উনাকে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (পিতৃব্য) দেওয়ান আফতাবুর রাজার সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায়

জড়াতে হয়। মামলায় জয়লাভ করেও পরবর্তীতে উনার অংশটি আফতাবুর রাজার বড় ছেলে দেওয়ান আনোয়ার রাজা সাহেবের অনুকূলে হস্তান্তর করেন। সহায় সম্পত্তি দেখভালের পাশাপাশি দেওয়ান সাহেব বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথেও যুক্ত ছিলেন। নিজ প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় এবং শ্রম দিয়ে একসময় সুনামগঞ্জ শহরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। পিতার ঋণ শোধ করে এক সময় বন্ধকী সমূদয় সম্পত্তিও উদ্ধার করেন। আশে পাশের অনেকেই জায়গা জমি উনার কাছে বিক্রি করার ফলে হাছন নগরের বসতবাটিটির কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে দৃষ্টিনন্দন এই বাড়ীটি দেওয়ান বাড়ী নামে সুপরিচিত। পাকিস্থান আমলে দেওয়ান সাহেব সক্রিয় কোন রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও প্রগতিশীল ভাবধারার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে তিনি দীর্ঘদিন সুনামগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পৌরসভার দায়িত্ব পালনকালে সুনামগঞ্জ শহরের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসহ সুনামগঞ্জ কলেজ পরিচালনা পর্ষদেরও সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

সুনামগঞ্জ শহরে নজিরউদ্দিন সাহেবের বাসস্থান, দেওয়ান সাহেবের নিকটতম প্রতিবেশী অবস্থানে ছিল। দুজনের সুসম্পর্ক ছিল। দেওয়ান সাহেব প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেবের চাচাত শ্যালক এবং বীরগাঁওয়ের উকিল সাহেবের মামা শ্বশুর সম্পর্কীয় ছিলেন। এই দুজন নজিরউদ্দিন সাহেবের খুবই ঘনিষ্ঠ বিধায় দেওয়ান সাহেবের সাথেও উনার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের যাতায়াতও ছিল। সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তাফা দিয়ে চলে যাওয়ার পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব পরবর্তীতে ছুটিছাটায় সুনামগঞ্জ এলে দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। নজিরউদ্দিন সাহেবও খবর পেলে ছুটে গিয়ে ওই বাড়ীতে আজরফ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিন জনে মিলে বিভিন্ন বিষয়ে গল্পগুজব করতেন। পরে নজিরউদ্দিন সাহেব তবলীগ এবং ধর্মকর্মে বেশী মনোযোগী হওয়ার কারণে আগের মত যাতায়ত আর অব্যাহত রাখতে পারেন নি। তবে তাদের সম্পর্কে কখনো কোন ভাটা পরেনি।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে গণ জোয়ার এবং দেওয়ান সাহেবের জনপ্রিয় ব্যক্তি ইমেজের কারণে সুনামগঞ্জ সদর আসনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন। উক্ত আসনে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উনার নিকটাত্মীয় ছিলেন। দুজনেই উনার জ্যেষ্ঠ এবং তুলনামুলক ভাবে রাজনীতিতে পরিপক্ক ছিলেন। একজন মামাত ভাই পি, ডি, পি প্রার্থী পাকিস্থানের ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী সাহেব। অপরজন চাচাত ভাই ন্যাপ (মোজাফফর) প্রার্থী দেওয়ান আনোয়ার রাজা সাহেব। দুজনেই নির্বাচনে ধরাশায়ী হন। মাহমুদ আলী সাহেবের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। এই নির্বাচনে বিজয়ী দেওয়ান সাহেবকে তারকা খ্যাতি এনে দেয়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন পাকিস্থানের সামরিক জান্তার অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে সুনামগঞ্জের রাজনীতিও সাড়া পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

উপদেশ মত এখানেও বিক্ষোভ, মিটিং, মিছিল এবং পরিশেষে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। সদর আসনের সংসদ সদস্য হওয়ার কারণে সুনামগঞ্জে দেওয়ান সাহেব উদ্ভূত পরিস্থিতির নেতৃত্বে চলে আসেন। দেওয়ান বাড়ীতে সব সময় নেতাদের শলা পরামর্শ এবং মিটিং লেগেই ছিল। একাত্তর সালের মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলিতে সুনামগঞ্জবাসীকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মসূচী সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান দেওয়ান সাহেব সহ অন্য সকল বিভিন্ন দলের মুক্তি পাগল নেতৃবৃন্দ। নেতারা ঐকমত্যে পৌঁছেন কিভাবে কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে চলমান বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি প্রয়োজনে জনগণকে সাথে নিয়ে সামরিক জান্তা দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধের পাশাপাশি প্রতিঘাতের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। তবে সুনামগঞ্জ সহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল তুলনামুলকভাবে শান্ত ছিল। বড় ধরণের কোন সহিংসতা এখানে ঘটেনি। একাত্তরের মার্চ মাসে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরো অবনতি হলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মত সুনামগঞ্জেও নেতৃবৃন্দ প্রতিরোধ বর্ম গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন।

কেন্দ্রের নির্দেশনার আলোকে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে শক্তিশালী একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলা হবে। প্রয়োজনে আক্রান্ত হলে এই বাহিনী আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিবে। এলক্ষ্যে আনসার বাহিনীর সদস্য ও স্ব-প্রণোদিত তরুণ ছাত্র জনতা মিলে ষাট-সত্তর জনের একটি দল গঠন করা হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই দলকে প্রস্তুত রাখা হয়। আনসার বাহিনীর রাইফেল আর গোলাবারুদ ছিল এঁদের অস্ত্রশস্ত্র। এই বাহিনী আক্রমণাত্মক হবে না প্রতিরোধক হবে এনিয়ে বাহিনীর অতি উৎসাহী তরুণ সদস্যদের সাথে দেওয়ান সাহেব সহ অন্যান্য নেতাদের মতানৈক্য দেখা হয়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। যাহোক আলাপ আলোচনা করে পরবর্তীতে এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সামাল দেয়া হয়। মার্চের শেষ দিকে পাক বাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্যের সাথে সুনামগঞ্জ ডাকবাংলোতে আমাদের এই বীর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পুলিশ ও ই, পি, আর (বর্তমান বি, জি, বি) এর বাঙালী সদস্যরাও নিজ নিজ অস্ত্র হাতে অংশ নেন। যুদ্ধে মুক্তিকামী সিপাহি জনতার বিজয় হয়। সামরিক জান্তার কিছু সদস্য মৃত্যুবরণ করে আর কিছু রাতের আঁধারে সুনামগঞ্জ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এর পর সামরিক জান্তার সম্ভাব্য আরো বড় ধরণের আক্রমণের আশংকায় অন্য সবার মত দেওয়ান সাহেবও পরিবার পরিজন নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের মেঘালয়ের বালাটের আশ্রয় শিবিরে অবস্থান নেন।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি মুক্তি যুদ্ধের সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। তদীয় বড় ছেলে প্রয়াত দেওয়ান মোসাদ্দেক রাজা ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। দেওয়ান সাহেব ভারতে থাকা অবস্থায় পাক বাহিনী ও তাঁর স্থানীয় দোসররা দেওয়ান বাড়ীটি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। অন্য অনেকের মত ব্যক্তিগত অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি এবং নয় মাসের অবর্ণনীয় ক্লেশ ও ত্যাগ তিতিক্ষার পর অবশেষে একাত্তর সালের

ডিসেম্বর মাসে বিজয়ীর বেশে নিজ মাতৃভূমি তথা সুনামগঞ্জে ফিরে আসেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ। বর্বর পাক বাহিনী পূর্ববাংলার সর্বত্র ধংস যজ্ঞ চালিয়ে ছারখার করে রেখে গেছে। সুনামগঞ্জও এর ব্যতিক্রম ছিল না। একজন সংসদ সদস্য হিসাবে দেওয়ান সাহেব বিধ্বস্ত মাতৃভূমি পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে সুনাগঞ্জের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়। সাড়া দেশের মত সুনামগঞ্জেও কিছু লোক আইন অমান্য করে নিজেদের ফায়দা হাসিলের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। অনেক অস্ত্রধারী ডাকাতি রাহাজানি সহ নানা ধরণের অপকর্মে লিপ্ত ছিল। সেসময় দেওয়ান সাহেব প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। আমাদের দেশে ভাল লোকদের রাজনীতিতে ঠাঁই হয় না। অপেক্ষাকৃত নবীন এবং সুস্থ ও সরল রাজনীতির অনুসারী দেওয়ান সাহেব রাজনীতির জটিল পাঠ বুঝে উঠতে পারেন নি অথবা বুঝলেও আস্তে আস্তে নিজেকে গুঁটিয়ে নিতে থাকেন। স্থানীয় বৈরী দলীয় কোন্দলের কারণে নিজেকে সতর্কভাবে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে তিনি আর নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নি। তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন অনেক আগে। এলাকার লোকজন এখনো তাঁকে একজন শ্রদ্ধাভাজন মানুষ হিসাবে স্মরণ করে। মহান আল্লাহ্ উনাকে বেহেশত নসীব করুন।

সামরিক জান্তার প্রতারণা ও অসহযোগ আন্দোলন

আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব বিজয় পাকিস্থানের শাসক গুষ্টির কাঙ্খিত ছিল না। তাই নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়ে যায় সামরিক জান্তা এবং পশ্চিম পাকিস্থানের কায়েমি স্বার্থ রক্ষাকারী গুষ্ঠির প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। নানা টালবাহানায় সংসদ অধিবেশন ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রলম্বিত করার চেষ্টা হতে লাগল। পূর্ববাংলার জনগণের তখন বুঝতে আর বাকী রইল না পাকিস্থানের সামরিক জান্তা এবং তাঁর দোসররা কখনোই বাঙালি নেতৃত্বের কাছে পাকিস্তান শাসন করার ক্ষমতা দিবে না। এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। কিন্তু সামরিক জান্তা এবং তার অনুগত প্রশাসন এই দুর্যোগ মোকাবিলায় চরম অবহেলা এবং উদাসীনতার পরিচয় দিল। এই সমস্ত ঘটনাবলী এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছাকৃত বিলম্বে পূর্ব–বাংলার জনগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। জনগণ ফোঁসতে লাগল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি শান্তিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানী সামরিক সরকার কার্যত কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ে। সরকারী আদেশ নির্দেশ উপেক্ষা করে অফিস আদালত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনগণ রাজপথে নেমে এল। বিক্ষোভের সাথে সাথে অবরোধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হল। স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম আস্তে আস্তে স্বাধীনতা আদায়ের

স্পৃহায় পরিণত হল। বাঙালি ছাত্রজনতা উপলব্ধি করল পাকিস্তানীদের সঙ্গে আর একত্রে থাকা যাবেনা। মওলানা ভাসানী এক জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দিয়ে পাকিস্তানীদের আসসালামু আলাইকুম বলেই দিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু জনগণের বিপুল রায় পাওয়া আওয়ামী লীগের দাবীর সমর্থক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানী শাসকদের এই অন্যায় ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তিনি সবসময়ই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন আর তাই বাঙালি নেতৃত্বের পক্ষাবলম্বী হয়ে উঠেন।

সুনামগঞ্জ শহরে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ

পূর্ববাংলার সেই ক্রান্তি-লগ্নে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাত্রিতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সামরিক জান্তা ঢাকা সহ পর্যায়ক্রমে পূর্ব বাংলার সর্বত্র সাধারণ মানুষের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাড়া দেশব্যাপি নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালান হয়। নিরীহ জনগণ আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে দিক্বিদিক ছুটতে লাগল। পঁচিশে মার্চ রাতে চূড়ান্ত আক্রমণের আগেই পাক সামরিক জান্তা ঢাকার সাথে সাড়া দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঢাকায় কি ঘটেছে বা ঘটছে? বঙ্গবন্ধু সহ আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী নেতাদের ভাগ্যেই বা কি ঘটেছে সুনামগঞ্জের মত প্রান্তিক শহর এবং জায়গার জনগণ কিছুই জানতে পারছিল না, বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে সবাই মনেমনে বুঝে গিয়েছিল মহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। আক্রান্ত হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। তাই আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত স্বাধীনতাকামী জনগণও বসে ছিল না। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ছাত্র-জনতা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল এবং ওদের আক্রমণ শুধু প্রতিহতই করল না আক্রমণাত্মক হয়ে সুনামগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রাথমিক বিজয়ও সূচিত হয়। সম্ভবত ২৭ শে মার্চ রাতে লেখক কয়েকজন সম-মনা বন্ধুসহ হাছননগর এলাকার নন্দীবাবুর বাড়ী সংলগ্ন ব্রিজে একত্রিত হয়েছেন। সকলেই উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও আলোচনারত। রাত তখন সাড়ে আটটা নয়টা হয়ত হবে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সতর্কতামূলক ভাবে শহরের রাস্তার বিজলী বাতি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আশেপাশের বাসাবাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। হঠাৎই লক্ষ্য করা গেল পশ্চিম দিক থেকে একটি জিপগাড়ি সোজা রাস্তা ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে। সবাই অনুমান করে নিল শত্রুর আগমন হয়ে গেছে। পরে জানা যায় একজন বাঙালী ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে এক প্লাটুন পাকিস্তানি সৈন্যের সেই রাতে আগমন হয়েছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধের যবনিকায় সুনামগঞ্জ থেকে পালিয়ে প্রাণে বাচলেও ওই বাঙালী ক্যাপ্টেন সাহেবের পরিণতি কি হয়েছিল পরে আর জানা যায় নি। নিমিষে আড্ডা ভঙ্গ করে যার যার মত সকলেই আত্মগোপনে চলে গেল। পরের দিন জানা যায় পাক বাহিনীর এই জীপগাড়িটির গন্তব্য ছিল দেওয়ান ওবায়দুর রাজার বসতবাড়ি। সেই রাতে তাঁরা আরো কয়েকজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সহ গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের

শহরের বাসাবাড়িতে হানা দেয়। তবে তাদের অপারেশন বিফলে যায়। নেতারা সবাই পরিস্থিতি আঁচ করে আগে থেকেই আত্মগোপনে ছিলেন। রাতে টহল শেষে পাক বাহিনী ডাকবাংলোয় অবস্থান নেয়। পরের দিনও তারা শহরময় টহল অব্যাহত রাখে এবং সামরিক আইন বলবতের ঘোষণা দেয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় কিন্তু কোন নেতাকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

দুপুরের খানিকটা আগে পাক বাহিনী ডাকবাংলোয় তাঁদের অবস্থানে ফিরে আসে। কিন্তু তখনো তাঁরা জানত না কি নিষ্ঠুর পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুনামগঞ্জ শহর ভারত সীমান্ত সংলগ্ন তাই শহরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (তখনকার ই, পি, আর) একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে সব সময় বিশ পঁচিশ জন জওয়ান থাকত। সৌভাগ্যবশত তখন এদের সবাই বাঙালি ছিলেন। তাদের সমরাস্ত্র ছিল শুধু থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর কিছু গুলি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মহকুমা পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে ছাত্র জনতা সহ পুলিশ সদস্যদের হাতে আগেই অস্ত্র তুলে দিয়ে সম্ভাব্য প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। এদের সাথে যুক্ত হলেন আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার বাহিনী ও ছাত্র জনতার একটি চৌকস দল। ডাকবাংলোয় তখন পাকিস্তানী সেনারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। আনুমানিক দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে মুক্তিকামী এই সম্মিলিত বাহিনী ডাকবাংলোয় পাক বাহিনীকে ঘিরে ফেললো। উদ্দেশ্য ছিল চাপ সৃষ্টি করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। কিন্তু মুক্তিকামী তরুণ যোদ্ধারা হঠাৎ করেই পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালেন। শুরু হল দুপক্ষের প্রচণ্ড গুলাগুলি বিনিময়। একদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সেনা। অন্যদিকে সাধারণ অস্ত্র হাতে তাও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বাঙালি ছাত্র জনতা আর তাদের সহযোগী পুলিশ, ই, পি, আর এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরা। অবিরাম গুলাগুলির শব্দ। আতঙ্কিত ডাকবাংলো সংলগ্ন শহরবাসী ভয়ে সবাই যারযার বাড়িঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন। সংঘর্ষ টানা কয়েক ঘন্টা চলার পর সন্ধ্যার পর থেকে বিক্ষিপ্ত আকারে গুলাগুলি চলতে থাকল। সেই রাতে কয়েক দফা ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বিপক্ষ দলের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সবাই ধারণা করল প্রতিপক্ষ পাকিস্তানী বাহিনীতে হতাহত বেশী হওয়ায় হয়ত ওরা দূর্বল হয়ে পরেছে। তাদের রসদ এবং খাদ্য সরবরাহেরও কোন যোগান ছিল না। যে কোন সময় তারা আত্মসমর্পণ অথবা পালাতে পারে। মুক্তিকামী যোদ্ধারা আরো নিবিড়ভাবে ডাকবাংলোকে ঘিরে রাখলেন। ইতিমধ্যে একজন মুক্তিকামী সৈনিক শহীদ হয়েছেন বলে জানা গেল। পাকিস্তানী বাহিনী রাতের দ্বিতীয় ভাগে আস্তে আস্তে নিশ্চুপ হয়ে গেল। গুলাগুলির কোন প্রত্যুত্তর করছে না। এভাবেই রাতের শেষ প্রহরে পাকিস্তানী

বাহিনীর ক্যাপ্টেন সাহেব আহত সৈনিকদের ফেলে কিছু অনুগত সেনা নিয়ে সুযোগ মত পালিয়ে যান। পরেরদিন জানা যায় তিনি রাতের অন্ধকারে সেনাদের নিয়ে চুপিচুপি ক্রলিং করে মুক্তি সেনাদের ফাঁকি দিয়ে ডাকবাংলো থেকে বেড়িয়ে পড়েন। পরে সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক দিয়ে পলিয়ে বেঁচে যান। ডাকবাংলোয় আটকে পরা পাকিস্তানী সৈন্যরা আহত এবং ক্ষুধার্ত থাকায় আক্রমণ প্রতিহত করার কোন ক্ষমতাই আর তাঁদের ছিল না। তাই পরের দিন দুপুরের পরে হঠাৎ করেই তাঁরা ডাকবাংলো থেকে বেড়িয়ে দক্ষিণে সরকারী পুকুর পাঁড় ধরে মরা টিলার দিকে দৌড়ে পালাতে লাগল। পালাতে পালাতে তাঁদেরই একজন গুলি করে একজন রিকশাচালককে হত্যা করে। কিন্তু কে বাঁচাবে তাদের। তাদের দলনেতা তাদের ফেলে আগেই পালিয়েছে। একেত ক্ষুধার্ত সাথে গুরুতর আহত দুজনই ধাওয়া খেয়ে মরাটিলার কাছেই ধানক্ষেতের আলে মৃত বত পরেছিল। সমবেত ছাত্র জনতা এদের পরে পিটিয়ে হত্যা করে।

এভাবেই সুনামগঞ্জে মুক্তিকামী ছাত্র জনতার প্রাথমিক বিজয় সাধিত হয়। একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে এরকম সহজ বিজয়ে সবাই যেমন আনন্দিত আহ্লাদিত হয়েছিলেন তেমনি সম্ভাব্য কঠোরতম প্রতি-আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্তও ছিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত দিশেহারা কিংকর্তব্যবিমূর গণ-মানুষ যার যার সুবিধা মত এরই মধ্যে আশেপাশের গ্রামগুলোতে এবং সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকাগুলোতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে মার্চের শেষ দিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিলেন। তাঁর এই উদাত্ত সাহসী আহ্বান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক ডামাডোলের সময়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

আতঙ্কিত জনতার ভারত ও গ্রামে-গঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ

ক্ষণস্থায়ী এই বিজয় সামরিক জান্তার বিমান আক্রমণের মুখে কিছুদিনের মধ্যে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বিমান হামলা শেষ হলে গ্রামে আশ্রয় নেয়া কেউ কেউ শহরে ফিরে আসেন। চারিদিকে ব্যাপক গুজব শতাধিক মানুষ হতাহত হয়েছে। গুজব কিছু মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। আমরা বাঙালীরা অতি মাত্রায় গুজব প্রিয়। গুজব শুনতে এবং ছড়াতে খুবই পছন্দ করি। পরে জানা যায় সুনামগঞ্জে ই, পি, আর ক্যাম্প লক্ষ্য করে বিমান হামলা হয়। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হাছননগর-আফতাবনগর রাস্তায় একটি বাঁশের পুলের নিকটবর্তী মাচাঙ্গে আঘাত করলে একজন সাধারণ নাগরিক আহত হন। অনেকে আবার এই যুদ্ধকে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সেই ঐতিহাসিক ব্রিটিশ বিরোধী অসম যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করলেন। তিতুমীর যেমন আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াই উন্নত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ব্রিটিশ সেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের তৈরি কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরে কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলে তিনি অগণিত

স্বাধীনতাকামী সহ শহীদ হন। সমালোচকেরা শুধু তিতুমীরের সাথে ব্রিটিশের যুদ্ধকে অস্ত্র-স্বস্ত্রের বাহ্যিক ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। সমালোচকেরা এই মহান যোদ্ধার স্বাধীনতার জন্য অন্তর্নিহিত অদম্য স্পৃহাকে গুরুত্বারোপে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছেন।

বিমান হামলার পরেপরেই সুনামগঞ্জ শহরের সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। শত্রু বাহিনী হয়ত আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে আবারো তাদের হারানো অবস্থানগুলো দখলে নিতে সক্রিয় হবে। এক অজানা আশংকায় শহরবাসী আতংকগ্রস্ত হয়ে পরলেন। শুরু হল ভারত-মুখি শরণার্থীর স্রোত এবং শহর ছেড়ে শত শত পরিবারের একটুখানি আশ্রয়ের আশায় গ্রামে গ্রামে অবস্থান গ্রহণ। গ্রাম বাংলার ধনি-গরিব সাধারণ মানুষ সেই চরম দুর্যোগ ও গোলযোগপূর্ণ সময়ে যে যেভাবে পারল গ্রামমূখী এই মানুষগুলোর সাহায্য সহায়তার জন্য এগিয়ে এল। সেই অসাধারণ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হৃদ্যতা এবং একে অপরকে আপন করে নেয়ার সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য সত্যি ভুলার নয়। ভারতও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াল এবং সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে শিবির খুলে শরণার্থীদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল। ভারত সরকারের সেই সময়ের সাহায্য সহায়তা ও সাধারণ জনগণের সহানুভূতি বাংলাদেশের মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে আজীবন স্মরণ রাখবে।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোজে নজিরউদ্দিন সাহেবের পরিবার

নজিরউদ্দিন সাহেবও পরিবার পরিজন নিয়ে অন্য সবার মত সুনামগঞ্জের অদূরে এক গ্রামে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কয়েক দিন থেকেই বড় এবং মেঝ ছেলের কোন খোঁজ খবর নেই। বড়ছেলে (লেখক) তখন সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধের পড়ে পড়েই সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের বালাটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরম্ভ না হওয়ায় ফিরে আসেন। বালাট কর্তৃপক্ষ তখন শরণার্থী সামাল দিতে ব্যস্ত। এরই মধ্যে নজিরউদ্দিন সাহেবের পরিচিত এবং সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরীরত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের এক ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে তার বাড়ীতে যাবেন বলে জানালেন। তিনি সঙ্গী খুঁজছেন। সিদ্ধান্ত হল নজিরউদ্দিন সাহেবের বড় এবং ছোট ছেলে তাঁর সঙ্গী হয়ে হবিগঞ্জে গ্রামের বাড়ীতে চলে যাবে। আর তিনি মেয়েদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে এভাবেই কিছুদিন কাটাবেন অতঃপর পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিবেন। মেঝ ছেলের তখনো কোন খবর নেই। সে সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের একজন স্থানীয় নেতা। বড়ছেলের মনে হবিগঞ্জ গেলে ওখান থেকে ভারতের আগরতলা অথবা সীমান্তবর্তী কোন এলাকায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সহজ হবে। তাদের সঙ্গে বড়ছেলের বাল্যবন্ধু প্রতিবেশী এনামুল হকও যুক্ত হল।

সিদ্ধান্ত মত প্রথম দিন সকাল দশটা সাড়ে দশটার দিকে তারা চার জনের দল সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তখন জোর গুজব যে কোন সময় এই সড়ক দিয়ে পাক বাহিনী সুনামগঞ্জ আসতে পারে। তাই তাঁরা পা চালিয়ে ও যথেষ্ট সতর্কতার সাথে যত শীঘ্র সম্ভব সুনামগঞ্জ থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূর জয়-কলস পৌঁছালেন। এখান থেকে তাঁদেরকে আর মহাসড়ক দিয়ে চলতে হবে না। ভিন্ন পথে তাঁদের গন্তব্যে যেতে হবে। যাত্রাপথে হয়ত আর পাক বাহিনীর সামনে পরার সম্ভাবনা কম। মনের মধ্যে সুপ্ত ভীতি দূর হওয়ায় সকলে আশ্বস্ত হলেন। জয়-কলস থেকে তারা কোনাকোনি পথে দিরাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নদী, খাল, বিল পাঁড় হয়ে কিছুক্ষণ হাঁটতে না হাঁটতেই বিকেল পেড়িয়ে সূর্যাস্ত ঘনিয়ে এল। হেঁটে গ্রামের বাড়ীতে যেতে পথিমধ্যে দুই রাত তাঁদের যাত্রা বিরতি দিতে হয়। প্রথমদিন সুনামগঞ্জ থেকে প্রায় বাইশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরবর্তী জয়-কলসের অনতিদূরে পাথারিয়া নামক গ্রামে এলে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কোথায় রাত কাটানো যায় এই চিন্তা নিয়ে গ্রামীণ পথে চলার সময় এক যুবকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। নিজে থেকেই পরিচয় দিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের পর ওই যুবক জানালেন তিনি সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র এবং নজিরউদ্দিন সাহেব তার পছন্দের একজন শিক্ষক। লেখককেও তিনি ভালভাবেই চিনেন। বিস্তারিত শুনার পর তাদের বাড়ীতে রাতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। সেদিন সেই যুবক অনেক কিছু খাইয়ে পরম আদরে যত্নে সবার সেবা যত্ন করেছিলেন। তার নাম এখন আর মনে পরছে না। তার জন্য দোয়া করছি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যেন সুস্থ থাকেন, ভাল থাকেন। দ্বিতীয় দিন সকালে নাস্তা খেয়েই সহৃদয় যুবকটি থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা বেড়িয়ে পড়লেন। আবারো খাল বিল নদী নালা পাঁড় হয়ে দিরাই আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দিরাই থেকে মারকুলি আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। হাওর আর বিস্তীর্ণ মাঠের ঘন সবুজ ফসলের আল পথ পাড়ি দিয়ে আসার পথে এক পশলা বৃষ্টিতে সবাই ভিজে একাকার। মারকুলিতে এসে আবারো একই চিন্তা কোথায় রাত কাটানো যায়। আকস্মিকভাবেই মারকুলি বাজারে লেখকের সাথে সুনামগঞ্জ কলেজের এক হিন্দু সহপাঠীর (নাম সম্ভবত বীরেশ) সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তাঁদেরকে জানাল মাইল খানেক দূরে শাখাতি গ্রামে মইনউদ্দিন চৌধুরীর বাড়ী। মইনউদ্দিন বাড়ীতেই আছে। ওখানে রাত কাটাতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। সহপাঠী বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাত হওয়ার আগেই পা চালিয়ে শাখাতি গ্রামে তারা পৌঁছালেন।

মইনউদ্দিন চৌধুরী সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র এবং একজন হাসিখুশি সংস্কৃতি-মনা মানুষ। সুনামগঞ্জে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটকের একজন হাস্যরসাত্মক সু-অভিনেতা হিসাবে তাঁর ভাল পরিচিতি ছিল। সে লেখকের

পূর্ব পরিচিত এবং বন্ধু-সম। মইনউদ্দিন তাঁদেরকে পেয়ে বেজায় খুশী হয়ে জড়িয়ে ধরল এবং রাতে মেহমানদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করল। মইনউদ্দিনের চাচার সঙ্গেও পরিচয় হল। তিনি নজিরউদ্দিন সাহেবকে-ত চিনেনই, নজিরউদ্দিন সাহেবের বড় ভাইও তাঁর সুপরিচিত। বলে রাখা ভাল মারকুলি এবং শাখাতি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার অন্তর্ভুক্ত। নজিরউদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ী উজিরপুরও বানিয়াচং থানার অন্তর্গত তবে সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে অবস্থিত। মারকুলি থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে এবং বানিয়াচং থানার দক্ষিণ পূর্ব কোণে ও প্রান্ত সীমানায় উজিরপুর গ্রাম। তৃতীয় দিন যথারীতি সকালের নাস্তা খেয়ে মইনউদ্দিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরা আবারো বেড়িয়ে পরলেন। দেশের সেই চরম দুর্যোগের সময় যাত্রা পথে রাত কাটানো দুই জায়গাতেই পরম যত্ন আত্তি ও আতিথেয়তা তাঁরা পেয়েছেন। লেখকের বন্ধু-সম শাখাতির মইনউদ্দিন চৌধুরীর হৃদ্যতা ও আতিথেয়তা ভুলার মত ছিল না। মইনউদ্দিন চৌধুরী এর পরে মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে আর ইহজগতে নাই। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসীব করুন। আবারো সেই হাওয়ের মধ্যে দিয়ে পথ চলা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল গ্রামের বাড়ী উজিরপুরে পৌছাতে পৌছাতে। সেখানেও লোকজনের সমাগম। ঢাকা থেকে সিলেটের পথে লোকজন নজিরউদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহন করেছেন এবং সবাই এই সমস্ত মেহমানদের পরম যত্ন নিয়ে সমাদর করছেন।

যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন

তিন চার দিন বাড়ীতে অবস্থানের পর লেখক সমবয়সী চাচাত ভাই সিলেট মদনমোহন কলেজের ছাত্র সাইদ চৌধুরীর (বর্তমানে ইংল্যান্ড প্রবাসী) সাথে শলা পরামর্শ করলেন কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায়। সিদ্ধান্ত হল হবিগঞ্জ হয়ে তেলিয়াপাড়া এবং সেখান থেকে সীমান্ত পাঁড়ি দিয়ে আগরতলা যাওয়া হবে। আগরতলা গেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের একটা ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে হবে। সেই মোতাবেক একদিন কাকডাকা ভোরে সবার অগোচরে লেখক, সাইদ চৌধুরী এবং সাথী বন্ধু এনাম সহ তিনজন বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পরলেন। হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ সড়ক পথে তাঁরা হবিগঞ্জ শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সাড়া দিন পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায় তারপর রাত হয়ে গেলে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নেয়া যাবে। প্রয়োজনে পথিমধ্যে লেখকের মামাবাড়ি উজিরপুর থেকে প্রায় পনের ষোল মাইল দূরবর্তী দরিয়াপুরে রাত কাটানো যাবে। কিন্তু বিধি বাম। সকালে ছেলেদের কোন সাঁড়াশব্দ না পেয়ে সাইদ চৌধুরীর পিতা সন্দেহ করে তাদের অনুসরণ করা শুরু করলেন। সড়ক পথে তখনো তাঁরা হবিগঞ্জ পর্যন্ত পৌছাতে পারেননি হটাৎ করেই সাইদ চৌধুরীর পিতা পিছন থেকে দ্রুত এসে তাঁর ছেলেকে লাঠিপেটা শুরু করে দিলেন এবং এভাবে না জানিয়ে বাড়ী থেকে বের হওয়ার জন্য সবাইকে খুব বকাঝকা করলেন। লেখককে বললেন তুমি আমার কাছে তোমার পিতার আমানত। তুমি কোনভাবেই

আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোথাও যেতে পারবে না। তাই সেদিন যাত্রা ভঙ্গ করে তাদের বাড়ী ফিরতে হল। পরে সাইদ চৌধুরীর বাবার সার্বক্ষণিক নজরদারীর কারনে লেখকের আর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি।

উজিরপুরের পাশের গ্রাম থাগাউড়া। মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক মেজর জেনারেল আব্দুর রব সাহেবের গ্রামের বাড়ী। এর কয়েক দিন পরেই হানাদার বাহিনী উনার গ্রামেরবাড়ী লক্ষ্য করে বিমান থেকে অবিরাম বোমা নিক্ষেপ এবং গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এতে রব সাহেবের বাড়ীসহ অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন লোক হতাহত হয়। এর পর থেকে উক্ত এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। কখন হানাদার বাহিনী এসে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, লোকজন হত্যা করে। উজিরপুর গ্রামের পাশ দিয়েই হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ মহাসড়ক আর উজিরপুর থেকে আরেকটা স্থানীয় ছোট রাস্তা দিয়ে থগাউড়া গ্রামটি মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত। রাস্তায় অদূরে কোন জীপগাড়ী দেখলেই আতঙ্কিত গ্রামবাসী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ওপারে বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিত। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হবিগঞ্জ ভারত সীমান্তবর্তী তেলিয়াপাড়া এলাকায় হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ও প্রবল ছিল যে সেই যুদ্ধের গুলাগুলি ও মর্টার শেলের শব্দ রাতের বেলা সুদূর উজিরপুর থেকেও শুনা যেত।

বড় ও ছোট ছেলের গ্রামের বাড়ী উজিরপুর আসার আরো বেশ কিছুদিন পর নজিরউদ্দিন সাহেব পায়ে হেঁটে হঠাৎ একদিন মেঝ ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে এলেন। বললেন আমরা সুনামগঞ্জের অদূরে যে গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ে আছি সে কয়েকদিন আগে সেখানে এসেছে। গোপন সুত্রে খবর পাওয়া গেছে পাক হানাদার বাহিনীর দোসররা যে কোন সময় তাকে ধরতে সেখানে হানা দিতে পারে। সুনামগঞ্জে তাঁকে রাখা নিরাপদ নয় বিধায় গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। আসার পথে পূর্ব পরিচিত বীরগাঁওয়ে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। বীরগাঁওয়ে পুরনো পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণ ঠাট্টাচ্ছলে উনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা ভাবতাম আপনি বোধহয় সংসার বিষয়ে উদাসীন এক সুফী মানুষ। কিন্তু এখন দেখছি সন্তানের প্রতি আপনার অগাধ স্নেহ মমতা এবং দায়িত্বশীলতা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন এদের ভাল মন্দ সহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের নামই-ত দুনিয়া আর সংসার। গ্রামের বাড়ীতে কয়েকদিন কাটিয়ে সুনামগঞ্জ ফেরার পথে ছোট ছেলেকে সাথে করে নিয়ে যান।

এর বেশ কিছুদিন পর তিনি আবার গ্রামের বাড়ীতে খবর পাঠালেন মেঝ ছেলেকে সুনামগঞ্জ শান্তি কমিটির সামনে হাজির করতে হবে। বড় ছেলে যেন তাকে নিয়ে ট্রেন যোগে সিলেটে উনার ভাতিজা সালেহ চৌধুরীর, তখন সিলেট বেতারের ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে ইংল্যান্ড প্রবাসী বাসায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে সে সময়মত সুনামগঞ্জ আসবে। সুনামগঞ্জে ভ্রান্ত ইসলামী আকিদার অনুসারী কিন্তু পাকিস্তানের অপরাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এবং তখন সামরিক জান্তার আজ্ঞাবহ দুষ্কৃতকারীরা উনার নীতি আদর্শ অপছন্দ করত। এবার সুযোগ পেয়ে

তারা প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইল। পরিবারের সমূহ বিপদ হতে রক্ষা পেতে বড়ছেলে গ্রামের বাড়ীর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং শান্তি কমিটির নিকট থেকে প্রত্যায়নপত্র সংগ্রহ করে মেঝ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ হয়ে ট্রেন যোগে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন রাস্তাঘাটে চলাচল করা খুবই বিপদজনক ছিল বিশেষ করে তরুণ বয়সীদের জন্য। জায়গায় জায়গায় আর্মি রাজাকারদের চেকিং হত। উঠতি বয়সের ছেলেদের দেখলেই মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে হেনস্থা করত। শান্তি কমিটির কাগজপত্র দেখাতে না পারলে সমূহ বিপদ এমনকি মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। তাই নিরাপত্তার খাতিরে সকলকে শান্তি কমিটির প্রত্যায়নপত্র সঙ্গে রাখতে হোত। শ্রীমঙ্গলে ট্রেন বিরতিতে থামলে চার পাঁচ জন মিলিটারি ট্রেনে ওদের বগিতে উঠে শুধুমাত্র তাঁদের কাছেই পরিচিতির কাগজপত্র বা আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইল। রাখে আল্লাহ্ মারে কে। কাগজপত্র দেখালে কি বুঝল বুঝা গেল না, ক্রূর দৃষ্টি বিনিময় করে ট্রেন থেকে নেমে গেল। আল্লাহর রহমতে এর পর সিলেট পর্যন্ত তাদের আর কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

পাক হানাদার বাহিনীর সমালোচনায় অকুতোভয়

নজিরউদ্দিন সাহেব যেটা সত্য জানতেন তা প্রকাশ করতে যেমন দ্বিধা করতেন না তেমনি অন্যায় এবং অন্যায্য কিছু চোখের সামনে হতে দেখলে প্রতিবাদ করতেন এবং সোচ্চার হতেন। একাত্তর সালের অবরুদ্ধ সেই বিভীষিকাময় দিনগুলিতে সিলেট সুনামগঞ্জ মোটরবাসে যাতায়াতেও ভোগান্তির শেষ ছিল না। মিলিটারি মিলিশিয়া রাজাকাররা জায়গায় জায়গায় বাস দাঁড় করিয়ে চেকিং এর নামে যাত্রীদের হয়রানি হেনস্থা করত। নজিরউদ্দিন সাহেব বাসে থাকলে এর জন্য প্রতিবাদ মুখর হওয়ার চেষ্টা করতেন। যাত্রীরা সবাই ভীত থাকতেন তাই এই প্রতিবাদ মিলিটারি / মিলিশিয়া পর্যন্ত গড়াত না। কিন্তু একবার এমন হল ওদের এই আচরণের জন্য তিনি অতিমাত্রায় প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন। সেদিন বাসে সুনামগঞ্জ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক তওফিকুল আম্বিয়া সাহেব এবং বড় ছেলে বাসে উনার সহযাত্রী ছিলেন। বাসের অন্যান্য যাত্রী সহ সবাই মিলে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে উনাকে বললেন আপনি শান্ত না হলে আমরা সবাই আজ মারা পরব। সেযাত্রা তিনি সকলের কথা শুনে সবর করলে আল্লাহ্র রহমতে পরিস্থিতি খারাপ হয়নি।

বিজয় দোরগোড়ায়

একাত্তরের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ আরো অধিক গতি লাভ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘনঘন গেরিলা আক্রমণ এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে যুদ্ধ আরো জোরদার করার ফলে পর্যুদস্ত পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। সবাই আশংকা করছিল রক্তক্ষয়ী পাক-ভারত যুদ্ধ অতি আসন্ন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে এই আশংকা আরো ঘনীভূত হল। দেশের ভিতরের অবরুদ্ধ মানুষ যার যার মত

নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে বিজয়ের মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়। ডিসেম্বর মাসে পাকিস্থান ভারতের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধকে আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত করে দেয়। ভারতীয় বিমান আক্রমণের মুখে অতি দ্রুততায় পূর্ব পাকিস্তানের বিমান বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পাকিস্থানের সামরিক বাহিনী কোণঠাসা হয়ে চারিদিক থেকে পলায়নপর হয়ে ক্যান্টনমেন্ট গুলোতে আশ্রয় নিতে থাকে। এই অবস্থায় তাদের পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করা তখন সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। সুনামগঞ্জে শুধু পাক বাহিনীর পক্ষে আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য কালো সালওয়ার ও কুর্তা পরিহিত মিলিশিয়ারা টহলরত ছিল। নিয়মিত বাহিনী হয়ত আগেই সিলেট সেনানিবাসে সড়ে গিয়েছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে মিলিশিয়ারাও অবশ্যম্ভাবী পরাজয় অতি নিকটবর্তী চিন্তা করে পালাতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে লেখক এক রাইফেল-ধারী মিলিশিয়ার উদ্ধত আচরণের সম্মুখীন হয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন।

সুনামগঞ্জের হাছন নগর পয়েন্টে (বর্তমানে ময়নার পয়েন্ট) দুই ভাই ময়না ভাই ও মোছন ভাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। ময়না ভাই রেস্টুরেন্ট চালাতেন আর এর বিপরীত দিকে ছিল মোছন ভাইয়ের মুদির দোকান। লেখক পারিবারিক কোন কিছু খরিদ করতে মোছন ভাইয়ের দোকানে গিয়েছেন। কেনাকাটা শেষে মোছন ভাইকে মূল্য পরিশোধের জন্য লেখক এক টাকার নোট (তখন এক রুপি) দিলেন। নোটটি কিছুটা জীর্ণ ছিল। মোছন ভাই কিছু সময় নিয়ে নোটটি দেখছিলেন। ইতিমধ্যে একজন রাইফেল-ধারী মিলিশিয়া সেখানে উপস্থিত হয়েছে মোছনভাই এবং লেখক কেউই খেয়াল করেন নি। সে লেখককে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল তুমি কে? নিশ্চয়ই কোন মুক্তি। এইজন্যেই তোমার কাছে এত জীর্ণশীর্ণ নোট। লেখক যতই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন সে ততই ক্রোধান্বিত হতে লাগল। একপর্যায়ে সে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে উদ্যত হল। মোছনভাই তাড়াতাড়ি চৌকি (তিনি ক্যাশ বাক্সের সাথে চৌকিতে বসা ছিলেন) থেকে নেমে মিলিশিয়ার হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন ইনি আমাদের স্যারের ছেলে। খুবই ভাল মানুষের ছেলে। ডাক্তারী পড়ছেন। মিলিশিয়াটি সদয় হয়ে রাইফেল আবারো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। মোছনভাই ইশারায় লেখককে দোকান থেকে চলে যেতে বললেন। সে যাত্রায় এভাবেই প্রাণে বাঁচেন লেখক।

এর পরের দিনই শুনা গেল মিলিশিয়ারা সবাই সুনামগঞ্জ ছেড়ে পালিয়েছে। সামরিক জান্তার দালাল দোসর যা ছিল সবাই পালিয়েছে। শহরে প্রতিপক্ষ আর কেউ নেই। মুক্তিকামী শহরবাসী তখন চূড়ান্ত বিজয়ের অপেক্ষায়। তারপর থেকে সুনামগঞ্জ মুক্তই ছিল। সেই উৎকন্ঠার দিনগুলোতে লেখক সমমনাদের সাথে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে খবরাখবর বিনিময় করতেন। তাদের আর বুঝতে বাকী থাকল না সুনামগঞ্জ এখন হানাদার বাহিনী মুক্ত। সেই আনন্দঘন মুহূর্ত উদযাপনের লক্ষ্যে লেখক হাছন নগরের টুনু ভাই, আ, ত, ম সালেহ সহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলে জয় বাংলা ও অন্যান্য জয়ধ্বনি করে সুনামগঞ্জে প্রথম বিজয় আনন্দ মিছিল বের করেন। বিজয়ের এই

ধারাবাহিকতায় ষোল ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর পঁচানব্বই হাজার সৈন্য ঢাকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্য দিয়ে সাড়া বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে শত্রু মুক্ত হয়। আমাদের প্রাণের দেশ বাংলাদেশ পাকিস্তানের যাঁতাকল থেকে বেড়িয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

মুক্তিযোদ্ধা এ, এইচ, এম সাব্বির মিনুর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বহু ত্যাগ তিতিক্ষা, মা-বোনদের ইজ্জত-হানি এবং সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা গঞ্জনার অবসান ঘটিয়ে জাতির গর্ব স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। অনেক বিপর্যয় এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্টের পরেও সবাই বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত, আত্মহারা। নয় মাসের আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধবের বিরহ বিচ্ছেদে কাতর বাঙালি একে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে উৎসব মুখর পরিবেশে এই বিজয় উদযাপন করছে। লেখকের সহপাঠী, বন্ধু বান্ধবের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই বীর যোদ্ধাদের দলে আছেন এ, এইচ, সাব্বির মিনু, দেওয়ান মোসাদ্দেক রাজা, বজলুল মজিদ খসরু, সামছুল হক, আবু হেনা, সালিক সালেহ প্রমূখ। অনেকেই শ্মশ্রুমণ্ডিত। অনেক ধকল গেছে তাদের উপর দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ কালীন নয় মাসের জীবন মরণ সংগ্রামে সবাই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। এখন তাদের দরকার পর্যাপ্ত বিশ্রাম। তারপরেও বাড়ীতে বসে নেই কেউ। বিপর্যস্ত ভাঙ্গাচোরা এই দেশটাকে এখন সবাই মিলে গড়তে হবে।

সদ্য রণ-ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত সুনামগঞ্জের তরুণরা এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন। যুদ্ধের নয় মাস দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জনগণের ফেলে যাওয়া অরক্ষিত যে সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ এবং লুণ্ঠন করেছিল মুক্তিযোদ্ধা এ, এইচ, এম সাব্বির মিনুর নেতৃত্বে প্রাথমিকভাবে হাছননগর এবং ষোলঘর এলাকায় সন্দেহ ভাজনদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তল্লাশি চালান শুরু করলেন। এতে অনেকের কাছ থেকেই লুণ্ঠিত আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে জব্দ হওয়া এইসব মালপত্র পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই উদ্যোগ সুনামগঞ্জের অন্যান্য মহল্লায়ও পরিচালিত হয়। তরুণদের দেশের মানুষের ভাল কিছু করার ও দেশ গড়ার ও কাজে লাগার এই উদ্যম ও আগ্রহ সত্যি প্রশংসার দাবীদার। লেখক সাব্বির মিনুর নেতৃত্বে পরিচালিত এই উদ্ধার কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

নির্ভীক এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান

দেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। তখনো সরকার ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর নয়। এই অবস্থায় সুনামগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রক্ষার্থে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছেন। শহরের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ যেন কোন অবস্থাতেই নষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। কেউ যেন কোন অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সেজন্যে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। তবে এর মধ্যেও কিন্তু অতি উৎসাহীদের কর্মকাণ্ড থেমে ছিল না। দুঃখজনক ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ সুনামগঞ্জ শহীদ মিনারকে ঘিরে শ্রদ্ধা জানানোর মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে জনসাধারণকে চাপ দিয়ে তা পালনে বাধ্য করছিলেন। কিন্তু এতে যে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঁচ আসছে তা হয়ত তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। সুনামগঞ্জ পুরাতন কলেজ সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচল কালে পথচারী সবাইকে কয়েকজন অস্ত্র হাতে পায়ের জুতা এবং মাথার টুপি খুলতে বাধ্য করছিলেন। যদিও রাস্তা থেকে শহীদ মিনারের বেদী বেশ দূরে এবং সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে বেদীতে যেতে হয়। এতে অনেক মুসলিম নাগরিক হেনস্থা হচ্ছিলেন। নজিরউদ্দিন সাহেব এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের এই আচরণের সম্মুখীন হলেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তারা নজিরউদ্দিন সাহেবের উপর খুব রুষ্ট হল এবং উনাকে ধরে তখনকার বি, এস, এফ কমান্ডার যিনি যৌথ বাহিনীরও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, ক্যাপ্টেন ইয়াদবের কাছে নিয়ে গেল। নজিরউদ্দিন সাহেব ক্যাপ্টেন সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন আমি কি সামরিক বাহিনীর লোক যে টুপি খুলব আর জুতাই বা খুলার প্রয়োজন কেন হবে? আমি ত মুল বেদীতে যাচ্ছি না বা উঠছি না। আমি একজন মুসলমান। মাথায় টুপি পড়া আমাদের ধর্মীয় রেওয়াজ। ধর্ম সবার উপরে। কোরো ধর্মীয় আচার/অনুভূতির উপর আঘাত হানা সমীচীন হবে না। ক্যাপ্টেন সাহেব উনার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে উনাকে ছেড়ে দেন। এর পরে টুপি খুলা বন্ধ হয়েছিল। তবে জুতা খুলা অব্যাহত ছিল যা পরে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়। নজিরউদ্দিন সাহেব বলতেন একজন সাচ্চা মুসলমানের কাজ হল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতসহ সকল আকিদা পরিপন্থী কাজ এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। এরা বুঝে না বুঝে মানুষকে হয়রানি করছে। আল্লাহ্ অবশ্যই মোমিন মুসলমানদের সহায়তা করবেন। কিন্তু হায় আজকাল আমরা কি দেখি, কিভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে বিশ্বময় অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে মুসলমান নামধারী কতিপয় উগ্র-গুষ্ঠি। যেখানে অকারণে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ সেখানে নিরীহ মুসলমান হত্যা করতেও দ্বিধা করা হচ্ছে না। ইসলাম ও মুসলমানদের মুল আদর্শ থেকে বিচ্যুত এইসব কর্মকাণ্ড মুসলমানদের মাথা সাড়া পৃথিবীতে নত করে দিচ্ছে। জাতি হিসাবে মুসলমানদের অনেকটাই আজ একঘরে করে ফেলেছে।

একটি বিপর্যস্ত স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানীরা সবদিক থেকে আমাদের দেশটাকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে রেখে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভঙ্গুর ও নাজেহাল পর্যায়ে আছে। জায়গায় জায়গায় ব্রিজ, সড়কপথ ও রেলপথের সমূহ ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। এগুলো মেরামত করে রাতারাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা খুবই দুষ্কর এবং দুরুহ কাজ। নয় মাসের যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থাও খুবই নাজুক। সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার খুবই আন্তরিক ও সচেষ্ট। প্রয়োজন অনেক অনেক আর্থিক সাহায্য সহায়তার। এই মুহূর্তে পাকিস্থান সরকার থেকে পাওনা আদায় খুবই দুরুহ ব্যাপার। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংস্থাগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এক শ্রেনীর লুটেরাদের কারনে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। এরা সব কিছু লুটেপুটে খাওয়ার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। ব্যাঙ্ক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আরো বেশি প্রকট। সুনামগঞ্জ কলেজ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ কয়েকমাস যাবত তাদের বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। সবাই কষ্ট হলেও কোনরকমে পরিবার পরিজন নিয়ে পরিস্থিতির উন্নতির অপেক্ষায় আছেন। আস্তে আস্তে এই অবস্থার অবসান হতে থাকে এবং সবকিছুতেই কিছুটা হলেও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

স্বাধীন বাংলাদেশে স্বার্থান্বেষী গুষ্ঠি কর্তৃক হয়রানির শিকার

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রাথমিক অরাজক অবস্থা দূরীভূত হয়ে সুনামগঞ্জ সহ দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। সবাই যারযার কাজেকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। নজিরউদ্দিন সাহেবও কলেজে তাঁর নিয়মিত কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে নীতিবান, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের শত্রুর অভাব নেই। এরই মধ্যে নজিরউদ্দিন সাহেবের কাছে খবর এসেছে উনাকে দালাল বানানোর চেষ্টা চলছে। এমনকি উনাকে গ্রেফতারও করা হতে পারে। কলেজ থেকে চাকরীচ্যুত করার জন্যই এই অপচেষ্টা। কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে যাদের একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাদেরই ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা দুষ্ট-চক্র এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওদের চক্রান্ত ছিল পর্যায়ক্রমে কলেজের সর্বোচ্চ পদগুলো তাদের পছন্দের লোক দিয়ে পূরণ করা। তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। এরকম নিকৃষ্ট প্রতিদান তিনি আশা করেন নি। কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর বড় ছেলের উদ্যোগে নজিরউদ্দিন সাহেবকে সুনামগঞ্জ থেকে সড়িয়ে নেওয়া হয়। বড় ছেলে তখন সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সিলেটে সুনামগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অনেক ছাত্রের সাথে প্রায়ই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়। নজিরউদ্দিন সাহেবের উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগ এবং এর পিছনের কুশীলবদের খবর তাদের অজানা ছিল না। তাঁরা আক্ষেপ করে বড় ছেলেকে বলতেন যাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতার কারনে স্যারকে পাকিস্থান আমলে অধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন

অনুমোদন করা হয়নি আজ তারাই উনার শত্রু। এটাই হয়ত নিয়তি আজ যিনি বন্ধু কাল তিনিই শত্রু। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বিপদ আপদে তাঁর অনুগত বান্দাদের পরীক্ষা করেন এবং তাদেরই সাহায্য করেন যারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল এবং তাঁকে সর্বোত্তম বিপদ তারিণী মনে করেন। নজিরউদ্দিন সাহেব সাড়া জীবন এই বিশ্বাস অন্তরে লালন করতেন। তিনি নিজে যেমন বিশ্বাসীদেরও আল্লাহ্র কাছে দোয়া ও আশ্রয় চাইতে বলতেন। কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই ভুয়া সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তিনি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসেন।

কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ

কলেজের একাডেমীক কার্যক্রম আগের মতই নিয়মমাফিক চলছে। মাঝে মধ্যে অবশ্য কলেজ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তখন ছাত্ররা নানাবিধ দাবী দাওয়া নিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে। অধ্যক্ষ মহোদয় দাবী পূরণ না করলে ছাত্ররা পরিচালনা পরিষদের কাছে ধর্ণা দেয় নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য। নজিরউদ্দিন সাহেবের কর্মব্যস্ততা তেমন একটা নেই। কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম অধ্যক্ষ সাহেব একাই সমাধা করেন। আরবী বিভাগে ছাত্র আগেও কম ছিল এখন আরো কম। হয়ত এজন্যে যে আরবী বিষয় হিসাবে ছাত্রদের কাছে কঠিন এবং দুর্বোধ্য। এরই মধ্যে সরকার শিক্ষাকে আরো সার্বজনীন ও জন-বান্ধব করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করাই উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে প্রতিটি মহকুমায় একটি সরকারী কলেজ স্থাপন অথবা ভূতপূর্ব বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুনা যাচ্ছে অচিরেই সুনামগঞ্জ কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। কারণে অকারণে কলেজ পরিচালনা পরিষদের স্থানীয় প্রভাবশালীদের কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরা আশায় আছেন সরকারীকরণ হলে চাকুরীতে সুযোগ সুবিধা বাড়বে। নিয়মিত বর্ধিত হারে বেতন ভাতা পাওয়া যাবে। অবসর কালীন ভাতা সহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধাও বাড়বে।। নজিরউদ্দিন সাহেবের কলেজের চাকুরীর সমাপ্তির আর বেশি বাকী নেই। এভাবেই চলতে চলতে আরো কয়েক বছর পর ১৯৭৫ সালে তিনি অবসরে যান। ইতিমধ্যে বড় ছেলে লেখাপড়া শেষে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছেন। মেঝ ছেলে সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে ঢাকায় আইন বিষয়ে অধ্যয়নের চিন্তা ভাবনা করছেন। যদিও হবিগঞ্জ শহরে অবসর পরবর্তী বাকী জীবন কাটানোর জন্য একখণ্ড জমি আগে থেকেই কেনা ছিল কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে তখনো সুনামগঞ্জে অবস্থান করছিলেন।

হবিগঞ্জ প্রত্যাবর্তন

অবসর নিলেও ছোট মেয়েগুলো তখনো সুনামগঞ্জের স্কুল কলেজে পড়ালেখা করছে। তাদের পড়ালেখার একটা দিক নিতে আরো কয়েক বছর সময় লাগবে। একটি পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে নুতন জায়গায় এসে স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়া এবং পড়াশুনার কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়ত তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে। এই বিবেচনায় অবসরের পরেও বেশ কয়েক বছর পরিবার পরিজন নিয়ে উনাকে সুনামগঞ্জে অবস্থান করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৮১ সালে হবিগঞ্জ শহরের নিউ-মুসলিম কোয়ার্টারে নিজের সদ্য নির্মিত বাসায় পরিবার পরিজন নিয়ে স্থানান্তরিত হন। ছেলে মেয়েদের জন্য বন্ধু বান্ধব-হীন নতুন পরিবেশে প্রথমদিকে মানিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয়। এটা সত্যি মানুষ তার ছেলেবেলার স্মৃতি ও পরিবেশ ভাবনা অত সহজে ভুলতে পারেনা। তাইত হারিয়ে যাওয়া সুখ দুঃখের ওই সব স্মৃতি তাদের বার বার মনে পড়ে আর শৈশবের সেই সব স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় ছুটে যেতে ইচ্ছা করে। হবিগঞ্জ জন্মস্থান হলেও অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে আসায় সবকিছু গুছিয়ে নিতে একটু আধটু বেগ পেতে হলেও আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় এক সময় সবকিছু ঠিক হয়ে যায়।

নজিরউদ্দিন সাহেব সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, মসজিদের মুসল্লিগণ এবং তবলীগের জামাতের অনুসারীদের সাথে অচিরেই উনার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আত্মীয় পরিচিত যতই ছোট অবস্থান অথবা অর্থনৈতিক ভাবে দূর্বল হউন না কেন তিনি সব সময় তাঁদের খোঁজ খবর রাখতেন। অনেক সময় অনাহূতের মত তাদের বাড়ী ঘরে যেতেন, কুশলাদি বিনিময় করতেন। তাঁরা তাঁকে প্রতিদানে খোজ খবর নিল কি না অথবা আপ্যায়ন করল কি না এসব বিষয়ে কখনো মাথা ঘামাতেন না। মুসল্লিদের অনুরোধে একসময় হবিগঞ্জ তবলীগ জামাতের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তবলীগ জামাতের হয়ে প্রায় প্রতি বছর টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমায় হাজির হতেন। শেষ বয়সেও শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে এর ব্যতিক্রম হয়নি। মাঝেমধ্যে ঢাকায় ছেলেমেয়েদের বাসায় এসে কিছুদিন কাটিয়ে আবার হবিগঞ্জের বাসায় ফিরে যেতেন। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ আদায়, তবলীগের কর্মকাণ্ড এবং বাসায় ধর্মালোচনা ও ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করেই উনার শেষ বয়সের দিনগুলো কেটে যেত। এভাবেই তবলীগের খেদমত এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ ও মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) কর্তৃক নির্দেশিত পথ ও পন্থায় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থেকে ১৯৮৫ সালে তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।

মানুষ মরণশীল, জন্মালে প্রতিটি প্রাণীকেই মরতে হবে। পবিত্র কুরআনের এই অমোঘ বাণী ধ্রুব সত্য এবং সবার বেলাতেই কার্যকর। বাতের সমস্যা ছাড়া নজিরউদ্দিন সাহেবের জটিল কোন রোগ বালাই ছিল না। সাতাশে মার্চ ২০০৪ সাল দুপুর থেকে অসুস্থবোধ করতে লাগলেন। ঐদিন রাতে জ্বর এল। পরেরদিন অবস্থার আরো অবনতি হল। খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন, তবলীগের অনুসারীগণ এবং মুসল্লিগণ দেখতে এলেন। সবাই মিলে দোয়া করলেন হে রাব্বুল আলামিন এই যদি উনার শেষ সময় হয়ে থাকে মা'বুদ তুমি ভাল জান, তাহলে

উনার জীবনাবসান ঘটাও। ইয়া আল্লাহ্ উনাকে মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট দিও না। আল্লাহ্র শান আমাদের বুঝা ভার। সমবেত দ্বীনী ভাইদের দোয়া হয়ত তিনি কবুল করলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ২৮ শে মার্চ ২০০৪ সাল ৮৭ বছর বয়সে নজিরউদ্দিন সাহেব ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। উনার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পরলে পরিচিত অপরিচিত বহু মানুষ এবং আত্মীয় স্বজন একনজর দেখার এবং দোয়া করার জন্য উনার বাসভবনে ভীড় করেন। হবিগঞ্জ টাউন মসজিদে প্রথম নামাজে জানাজা এবং পরে নিজ গ্রাম উজিরপুর প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে উনাকে দাফন করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ

নজিরউদ্দিন সাহেব খুবই বিনয়ী ও সদালাপী লোক ছিলেন। অহংকার ও মিথ্যাচার করাকে ঘৃণা করতেন। বলতেন অহংকার শুধুমাত্র সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহ্-তায়ালার। অহংকারী ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধু বা সমাজের যেই হোক না কেন এড়িয়ে চলতেন। আর মিথ্যা থেকেই সব গোনাহর উৎপত্তি মনে করতেন। গরিব, ধনী, উচ্চ বংশজাত কিংবা নিম্ন বংশীয় বলে মানুষের কোন ভেদাভেদ উনার কাছে ছিল না। মানুষকে আপ্যায়ন করতে ভালবাসতেন। তবলীগের ছোট বড় সকল পরিচিত ভাইদের নিজ বাসস্থানে আপ্যায়ন করে আনন্দ পেতেন। অন্যরা উনাকে আমন্ত্রণ করল কি না এনিয়ে কখনো ভাবতেন না। কখনো কারো সমালোচনা কিংবা কারো বিরুদ্ধে অরুচিকর কোন কথাবার্তা বলতেন না। খুবই স্পষ্টভাষী, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কারো সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতেন না এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার হতেন। নিজ ধর্মীয় অথবা ভিন্ন ধর্মীয় সবার সঙ্গেই সহজভাবে মেলামেশা করতেন। মেলামেশা করতে গিয়ে নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের কোন গুরুত্ব দিতেন না। কেউ খবর পাঠালে সাথে সাথে সাক্ষাত করতে চলে যেতেন। মুসলমান কোন ভাইবোনকে সামনে পেলে আগে থেকে সালাম দিতেন। এমনকি বাইরে থেকে বাসায় ফিরে পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম বলে সম্বোধন করতেন।

আত্মীয়স্বজনদের প্রতিও তিনি যথেষ্ট যত্নবান এবং দায়িত্বশীল ছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে একসঙ্গে সকল পুরুষ সদস্যদের নিয়ে জামাতে উনার ইমামতিতে বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতেন। উনাদের ভাইয়ে ভাইয়ে হৃদ্যতা ঈর্ষনীয় পর্যায়ে ছিল। কখনো কোন বিষয়ে মত বিরোধ বা মনোমালিন্য হয়নি। বড় ভাইকে পিতৃসম সম্মান শ্রদ্ধা করতেন। বিষয় সম্পত্তি বড় ভাই যাকে যেভাবে ভাগ করে দিয়েছেন সেই মত অনুজরা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন। ভাতিজা ভাগিনেয়রা যাতে লেখাপড়া করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে এবং সত্যিকার মমিন মুসলমান হয়ে উঠতে পারে এজন্যে সব সময় তাদেরকে সৎপরামর্শ এবং প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা দিতেন। গরীব আত্মীয় স্বজনেরা আর্থিক অথবা উনার সাধ্যের মধ্যে কোন সাহায্য চেয়ে কখনো

নিরাশ হননি। সংসারে সচ্ছলতা ছিল না, টানাটানি লেগেই ছিল এর মধ্যে থেকেও ফকির মিসকিনদের পকেটে যাই থাকত তা থেকেই সাহায্য করতেন। হাতে টাকা পয়সা না থাকলে বাসা থেকে চাল ডাল অথবা খাবার দাবার কিছু না কিছু দিতেন। অবসরের পর উনার কাছে টকা পয়সা ততটা থাকত না তখন ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে নিয়ে হলেও সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু না কিছু দিতেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় খুব একটা করতেন না। অবশ্য সঞ্চয়ের জন্য সব কিছু পরিচালনার পর উদ্বৃত্ত তেমন একটা থাকতও না। ভবিষ্যতের জন্য তোয়াক্কেল আলা আল্লাহ্ বলতেন। আর এজন্যেই উনার কোন কিছুই আটকে থাকেনি। আল্লাহ্র রহমতে সবকিছুই সময়মত সমাধা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পরিবারের কোন সিদ্ধান্ত তাদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে নিতেন।

উনার ব্যক্তি ও কর্মময় জীবন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কখনো নিজের ধর্মানূবর্তীতাকে বিসর্জন দেননি। বর্তমানে আমাদের সমাজে একদিকে যেমন ধর্মীয় উগ্রবাদীতার উত্থান মুসলমানদের বিশ্বময় নিরাপত্তাহীন এবং শান্তির ধর্ম হিসাবে ইসলামকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে অপর দিকে মুক্ত চিন্তার নামে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানাও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনার মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি যেমন ছিল না আবার অতি আধুনিকতার নামে ধর্ম-হীনতার কোন আশ্রয় প্রশ্রয় ছিলনা। এই দুই বিপরীতমুখী মতবাদের মধ্যেও ধর্মকর্ম পালন করেও কিভাবে বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজের অবস্থান দৃঢ় করে পথ চলা যায়, এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন।

উজিরপুরের চৌধুরী পরিবারের বংশানুক্রম

(মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের বংশ পরিচয়)
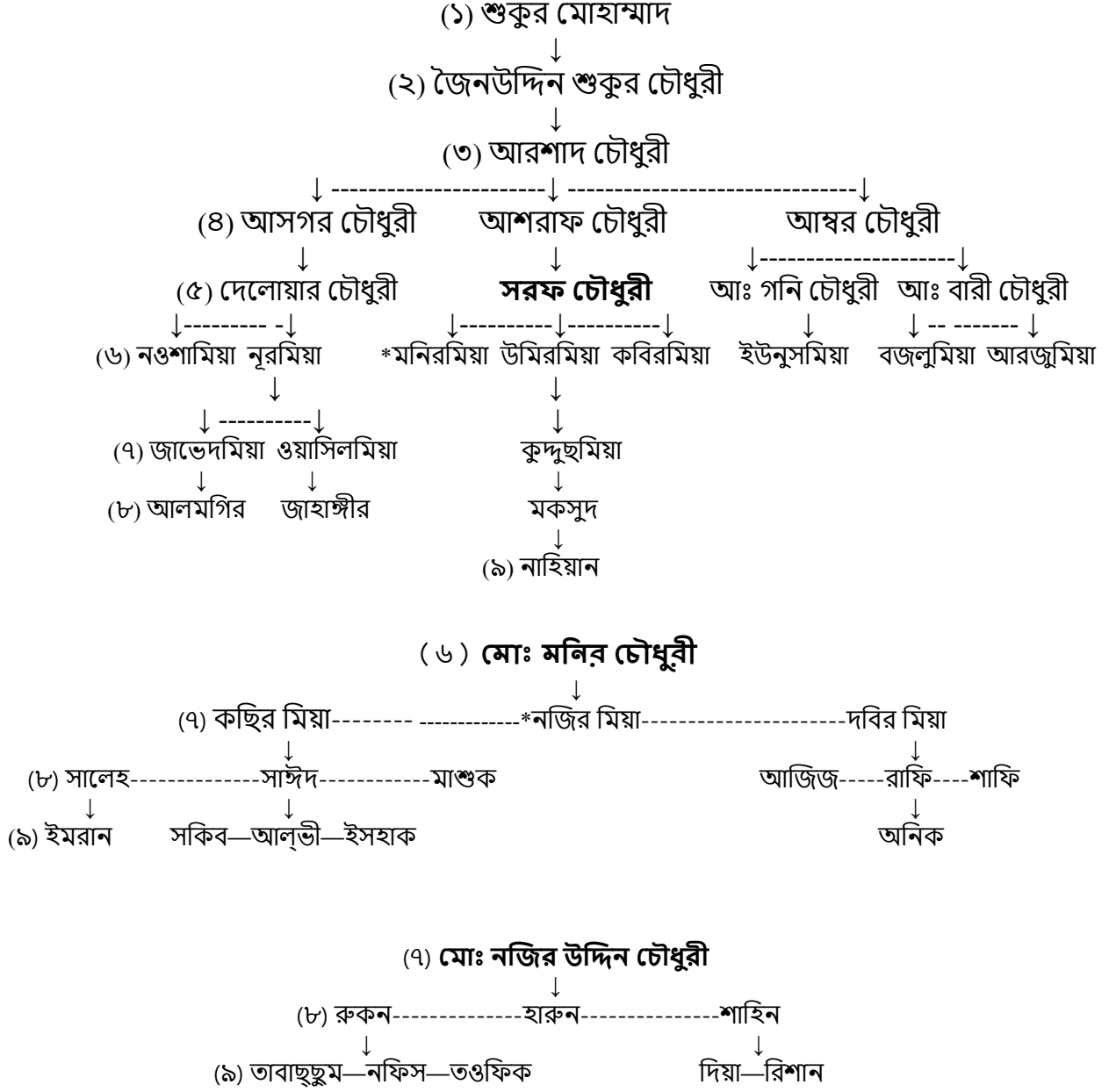
* মনির মিয়া – মোঃ মনির চৌধুরী; নজিরউদ্দিন সাহেবের পিতা

* নজির মিয়া – প্রফেসর মৌলভী মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী

টিকাঃ

শুকুর মোহাম্মাদ

তিনি উজিরপুরের চৌধুরী পরিবারের গুড়াপত্তনকারী আদি পুরুষ। উনার পূর্বপুরুষ আরব বংশোদ্ভূত একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। উক্ত দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারে এই দেশে আগমন করেন এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানা-ধীন দিনারপুরে বসতি স্থাপন করেন। এই দরবেশের উত্তরপুরুষগণ কেউ কেউ পারিবারিক পদবী খন্দকার/আখন্দ ব্যবহার করতেন। আবার দিনারপুরের টঙ্গী-টিলায় উক্ত দরবেশের উত্তরপুরুষ আরেকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার সৈয়দ পদবী ব্যবহার করছেন। লেখকের চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে উক্ত সৈয়দ পরিবারের এক পীর সাহেবের সাথে তাঁর মুরিদের বাড়ীতে সাক্ষাত হয়। তিনি লেখককে জানিয়েছিলেন তাঁরা এবং লেখকের পরিবার একই বংশোদ্ভূত। তবে নজির উদ্দিন সাহেব লেখককে বলেছেন চৌধুরী পূর্ববর্তী তাঁদের পারিবারের পদবী ছিল আখন্দ।

শুকুর মোহাম্মদ হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার অন্তর্গত কূরশা পরগণার উজিরপুর এলাকায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। নতুন সহায় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে তিনি দিনারপুরের বসতি ত্যাগ করে শাখা-বরাক নদী তীরবর্তী উজিরপুরে নুতন বসতবাটি স্থাপন করেন। বেশ বড়সড় এলাকা নিয়ে নুতন বসতবাটির ভূখণ্ডটি শাখা-বরাক নদী থেকে উত্থিত থাগাউরা গ্রামের দিকে ধাবিত একটি খাল দ্বারা মূল উজিরপুর গ্রাম থেকে পৃথকীকৃত। প্রাচীন নদী মাতৃক গ্রাম বাংলায় চলাচলের একমাত্র মাধ্যম নৌপথকে বিবেচনায় রেখে সর্বত্রই বাড়িঘর, বাজার ও গঞ্জ ইত্যাদি নদী তীরবর্তী উপকূলে গড়ে উঠেছে। শুকুর মোহাম্মদের বাড়ীর সামনে নদীর ওপারে পূর্বদিকে বিশাল ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওর আর এর শেষ সীমানায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দিনারপুরের পাহাড়। এই বসতবাটিটি তদীয় পৌত্র আরশাদ চৌধুরী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এখনো উক্ত বসতবাটির অবস্থান শাখা বরাক নদীর তীরে উঁচু টিবির মত উজিরপুরের বারেরা নামক স্থানে বিদ্যমান আছে। জৈনউদ্দিন শুকুর চৌধুরী শুকুর মুহাম্মদের একমাত্র পুত্র।

জৈন-উদ্দিন শুকুর চৌধুরী

তিনি ভূসম্পত্তি আর বিস্তৃত করেন এবং মিরাস ক্রয় করেন। উনার ক্রয়-কৃত মিরাস জন্দিশুকুর (উনার নামের আঞ্চলিক রূপ) তালুক নামে পরিচিত। আরশাদ চৌধুরী উনার একমাত্র পুত্র।

মোঃ আরশাদ চৌধুরী

তিনিও ভূসম্পত্তি ও মিরাস ক্রয় করে সহায় সম্পদ আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী লরহ্মপুর গ্রামের জনৈক মজিদউল্যার সঙ্গে যৌথভাবে কিং-কূরশা পরগণায় তালুক খরিদ করেন। এজন্যে উক্ত তালুক মোঃ আরশাদ ও মজিদউল্যা তালুক নামে পরিচিত। তিনি তাঁর পিতামহের উজিরপুরের বারেরার বসতবাটি পরিত্যাগ করেন এবং উক্ত বাটী থেকে কয়েক শত গজ দূরে কিং-কূরশা পরগণায় এবং উজিরপুর গ্রামেই নতুন বসতবাটি স্থাপন করেন। নতুন এবং পুরাতন বাটী দোটির মধ্যে এক সময়ের খরস্রোতা বর্তমানে মৃত প্রায় খাল এখনো বিদ্যমান। পরিত্যক্ত বাড়ীটি পরে জঙ্গলে পরিণত হয়। পরিত্যক্ত বাড়ীর পশ্চিম অংশ ঘাস জমে মাঠে পরিণত হওয়ায়

গ্রামের ছেলেরা ওখানে এক সময় খেলাধুলা করত। চৌধুরী বংশের কেউকেউ পরিত্যক্ত বাড়ীর একাংশ কবরস্থান হিসাবেও ব্যবহার করে আসছেন।

আরশাদ চৌধুরীর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। প্রথমা মেয়ের বিবাহ হয় নবীগঞ্জ থানার সুনাইত্তা পরগণার মস্তফাপুর গ্রামের চৌধুরী পরিবারে। উক্ত মেয়ের পুত্র সুলতান চৌধুরী নামজাদা মিরাসদার ছিলেন। দ্বিতীয়া মেয়ের বিয়ে হয় বাহুবল থানার ভাদেশ্বর গ্রামে। দ্বিতীয় মেয়ের পুত্র আব্দুল লতিফ চৌধুরী নানু মিয়া (উজিরপুরের সামছু মিয়া/চাঁন মিয়ার দাদা) । নানু মিয়ার পিতা পৈতৃক বাড়ী ভাদেশ্বর ত্যাগ করে উজিরপুরে স্থানান্তরিত হলে তাঁর অধঃস্থন বংশধরগন উজিরপুরেই বসবাস করতে থাকেন।

মোঃ আসগর চৌধুরী

তিনি মোগল মিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। আরশাদ চৌধুরীর প্রথম পুত্র। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। প্রথমা মেয়ের বিয়ে হয় হবিগঞ্জ সদর থানার বহুলা চৌধুরী বাড়ীতে। উক্ত মেয়ের পুত্র কাঁচা মিয়া নামজাদা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দ্বিতীয়া মেয়ের বিয়ে হয় বানিয়াচং সদর এলাকার তকবছখানি মহল্লায়। দ্বিতীয় মেয়ের পুত্র গোলাম আহাদ ওরফে জিলা মিয়া আরবী ও মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলানা ছিলেন। তিনি বানিয়াচং রাজ পরিবারের জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। এই দুই পরিবারের সদস্যরা ব্রিটিশ ও পাকিস্থান আমলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করে এলাকায় নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

মোঃ আশরাফ চৌধুরী

তিনি আসু মিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। আরশাদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি খুবই সুদর্শন ও সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী অত্যন্ত বলশালী ও সাহসী লোক ছিলেন। তখনকার দিনে উজিরপুর থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম খাগাউরায় সংযোগকারী খাল দিয়ে নৌকায় যাতায়াত করা যেত। খালের চারিদিক সেসময় খুবই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ওই জঙ্গলে বাঘ সহ নানা হিংস্র বন্য প্রাণী থাকত। একদা নৌকা যোগে ঐ পথে আসার সময় তিনি বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হন। অসীম সাহসী তিনি বাঘের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তিতে লিপ্ত হন এবং এক সময় বাঘটিকে কাবু করে ফেলেন। পরে নৌকায় থাকা অস্ত্র দিয়ে বাঘটির প্রাণ সংহার করেন। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে তিনি আস্তে আস্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরেন এবং কিছু দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। দুই মেয়েরই তাঁর আপন ভাইপো আব্দুল বারী চৌধুরী ওরফে আলফি/আলফু মিয়ার সঙ্গে প্রথম জনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়জনের বিবাহ হয়। দুই মেয়েরই মহামারীতে অকালে মৃত্যু হয় এবং তাদের কোন একজনের একমাত্র সন্তান ফজলু মিয়াও বাল্যবয়সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আম্বর চৌধুরী

আরশাদ চৌধুরীর তৃতীয় ছেলে। তাঁর দুই ছেলে ছিলেন। প্রথম ছেলে আব্দুল গনি চৌধুরী ওরফে আমরু মিয়া এবং দ্বিতীয় ছেলে আব্দুল বারী চৌধুরী ওরফে আলফি মিয়া।

দেলোয়ার চৌধুরী

তিনি আসগর চৌধুরী ওরফে মোগল মিয়ার একমাত্র পুত্র। পারিবারিক ভাবে তিনি দিলু মিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। আরবি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করায় তিনি মৌলানা দেলোয়ার চৌধুরী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বানিয়াচং রাজ পরিবারের আরবি শিক্ষক ও জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। উনার চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তিনি চাচাত ভাই শরাফত চৌধুরীর বড় ছেলে মনির চৌধুরী ওরফে মনির মিয়ার সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেন। উক্ত মেয়ের মেঝ পুত্র মোঃ নজিরউদ্দিন চৌধুরী। দেলোয়ার চৌধুরীর দুই পুত্র আবদু মিয়া ও হামদু মিয়া অকৃতদার থেকেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ভাগিনেয় বানিয়াচংয়ের তকবছখানি মহল্লার গোলাম আহাদ ওরফে জিলা মিয়াও মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম ছিলেন। তিনিও বানিয়াচং রাজ পরিবারের আরবীর শিক্ষক ও জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

মোঃ সরফ চৌধুরী (১৮৫০-১৯০৫)

তিনি আশরাফ চৌধুরী ওরফে আসু মিয়ার একমাত্র পুত্র এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের পিতামহ। তিনি শরাফত মিয়া সাহেব নামে বহুল পরিচিত এবং নিকট অতীতের উজিরপুরের চৌধুরী বংশের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তাঁর সময়েই উজিরপুরের চৌধুরী পরিবারের ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লেখাপড়া জানতেন। খুবই বিচক্ষন, বৈষয়িক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শরাফত মিয়া সাহেব ভূসম্পত্তি আরো অধিক বিস্তৃত করেন। তিনি ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওর এবং উজিরপুরের পশ্চিমের হাওরে অনেক জমিজমা ও বিল তখনকার সরকার থেকে নিলামে ক্রয় করেন। কথিত আছে ক্রয়কৃত ভূমি ১০০ হাল ও ৪০ হাল দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জমির দখল ও পতিত জমি আবাদি করার লক্ষ্যে চাচাত ভাই ও আপন ভগ্নীপতি আব্দুল বারী চৌধুরী ওরফে আলফি মিয়াকে ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরের সম্পত্তিতে শরিক করে নেন। বিস্তৃত সম্পত্তি ভালভাবে সুবন্দোবস্ত করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উনাকে বসত বাড়ীর পাশে বিশ্বস্ত এক প্রজার আঙ্গিনায় দাফন করা হয়। উনার কবরগাহ্ তার অধঃস্থন পুরুষগণ এখনো রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। তাঁর চার ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। তিনি চাচাত ভাই দিলু মিয়ার বড় ছেলে গজনফর আলী চৌধুরী ওরফে নওশা মিয়ার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেন। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আমির চৌধুরী বিয়ে করলেও কোন সন্তানহীন অবস্থায় যুবা বয়সে মৃত্যুবরন করেন।

আব্দুল বারী চৌধুরী

তিনি আম্বর চৌধুরীর দ্বিতীয় ছেলে। আলফি/আলফু মিয়া নামেও এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও খুবই বৈষয়িক জ্ঞান সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি আপন চাচাত বোন, শরাফত মিয়া সাহেবের ভগ্নি-দ্বয়কে প্রথম জনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়জনকে বিয়ে করেন। এই বিবাহের ফলে তিনি দুই বোনের ফরাইজ প্রাপ্ত হয়ে শরাফত মিয়ার পিতার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হন। তাছাড়া ঘুঙ্গিয়াজুরী হাওরেও শরাফত চৌধুরীর আনুকূল্যে বিস্তর সম্পত্তি ও বিল উনার দখলে আসে। পূর্ববর্তী দুই স্ত্রী ও তাদের কোন একজনের একমাত্র ছেলে ফজলু মিয়া অকালে মৃত্যুবরণ করায় তিনি পার্শ্ববর্তী বাড়ীর ওয়াজিদউল্যার কন্যার সাথে পরবর্তীতে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর চার ছেলে এবং এক মেয়ে ছিল। তিনি আপন ভাইপো আব্দুল গনি চৌধুরী ওরফে আমরু মিয়ার একমাত্র সন্তান ইউনুসুর রহমান চৌধুরী ওরফে ইউনুস মিয়ার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেন। তাঁর বড় ছেলে ফজলু মিয়া (শরাফত মিয়ার ভাগ্নে) শিশু বয়সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

গজনফর আলী চৌধুরী

ওরফে নওশা মিয়া, দেলোয়ার চৌধুরী ওরফে দিলু মিয়ার প্রথম পুত্র। তিনি খুবই সুদর্শন ছিলেন। শরাফত মিয়া সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে প্রচুর জমিজমা প্রাপ্ত হলেও একসময় দৈন্য-দশায় পতিত হন। তাঁর একমাত্র ছেলে লেইছ মিয়া কিশোর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। উনার দুই মেয়ে ছিল। প্রথমা মেয়ে বানিয়াচং থানার অন্তর্গত কালাইন্জুরা সৈয়দ বাড়ীতে বিয়ে হয়। তার দৌহিত্র সৈয়দ আব্দুল হান্নান ওরফে আবদাল মিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত লে: কর্নেল ছিলেন। দ্বিতীয়া মেয়ের বিয়ে হয় নবীগঞ্জের সুনাইত্তার মস্তফাপুর গ্রামে।

মোঃ মনির চৌধুরী (১৮৮০-১৯৫০)

ওরফে মনির মিয়া, শরাফত মিয়া সাহেবের প্রথম পুত্র। তিনি খুবই ধর্মভীরু, মৃদুভাষী, সজ্জন এবং সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তিনি মাইনর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। পিতা শরাফত মিয়া সাহেবের অ-সময়োচিত মৃত্যুতে প্রথম পুত্র হিসাবে নিজেদের সহায় সম্পদ রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। কিশোর এবং নাবালক ভাইদের নিয়ে তিনি অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত ভাগ বাটোয়ারা ও দখলদারিত্বের প্রশ্নে বিরোধ এমনকি মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পরিশেষে নিজের এবং ভাইদের সহায় সম্পত্তি রক্ষায় সমর্থ হন। পরবর্তীতে ভাইয়েরা সাবালক হলে যার যার অংশ তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। ব্রিটিশ আমলে যাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ভূসম্পত্তি ছিল তাঁদের সিলেটের আঞ্চলিক লোকাল বোর্ডের সম্মানিত ভোটার হিসাবে গণ্য করা হত। একান্নবর্তী পরিবারে মনির চৌধুরী সাহেবও একজন সম্মানিত ভোটার ছিলেন। ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য এবং মিরাসদারীর প্রয়োজনে প্রায়ই তাঁকে সিলেট যেতে হত। আবার তাঁর মেঝ পুত্র নজিরউদ্দিন সাহেব যখন সিলেটে পড়াশুনা করতেন তখন ছেলেকে দেখতে মাঝেমধ্যে অকস্মাৎই হোস্টেল অথবা মেসে গিয়ে হাজির হতেন।

তিনি দাবা খেলতে ভালবাসতেন এবং গুড় তাঁর খুবই পছন্দের খাবার ছিল। জনশ্রুতি আছে পছন্দের গুড় খাওয়ালে গ্রামের লোকদের হাওয়ের পতিত জমি দান করে দিতেন। উজিরপুরের জামে মসজিদে তিনি সব সময়ে দান খয়রাত করতেন এবং মসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর মতওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিরহংকারী এবং খুবই অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। গ্রামের লোকজন তাঁকে সম্মানের চোখে দেখত এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। কোন কারণ বশত একবার বিশ্বস্ত এক প্রজার অনুকূলে প্রায় ত্রিশ একর (৯০ বিঘা) পারিবারিক আবাদি জমি তিনি অধিভুক্ত দলিল মূলে হস্তান্তর করেন। পরে সময়মত উক্ত প্রজা আবারো দলিল মূলে তিনি এবং তাঁর ভাইদের নামে হস্তান্তরিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়। এটা নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ততা ও উনার প্রতি সম্মান বোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর সচ্ছল পরিবারে তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। মেয়েকে তিনি আজমিরিগঞ্জ থানাধীন জলসুখা গ্রামে বিয়ে দেন। উনার মেঝ ছেলে **মোঃ নজিরউদ্দিন চৌধুরী (১৯১৭-২০০৪) ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ (১৯৪১) পাশ করেন।**

মনির মিয়া সাহেব খুবই দূরদর্শী ছিলেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং অনাগত ভবিষ্যতে আরো বাড়বে ফলে বাসস্থান সংকট হতে পারে এই আশংকায় তিনি পূর্বপুরুষ আরশাদ চৌধুরী কর্তৃক স্থানান্তরিত বর্তমান চৌধুরী বাড়ী থেকে আশেপাশে অন্যত্র বসতবাড়ি সরিয়ে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। কিন্তু

জীবদ্দশায় তিনি সেটা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাড়ীর নিকটে পিতা শরাফত মিয়া সাহেবের কবরের পাশে উনাকেও দাফন করা হয়। কবর দুটো বিশ্বস্ত প্রজার ভিটে বাড়ীর আঙিনায় ছিল। পরে প্রজাস্বত্ব আইনে উক্ত ভিটে বাড়ীর উত্তরাধিকারীরা কবর সহ জমির মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে চৌধুরী বংশের অন্য শরিকের কাছে এটি হস্তান্তর করেছে। দুটো কবরই অধঃস্তন বংশধরগণ বাঁধাই করে রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। মনির চৌধুরীর বসতবাটি সড়ানোর লালিত বাসনা তাঁর পুত্রগণ পূরণ করেন। তাঁরা পুরাতন চৌধুরী বাড়ী থেকে কয়েক শত গজ দূরে কুরশা পরগণায় উজিরপুরের বারেরায় পরিবারের আদি পুরুষদের পরিত্যক্ত বাড়ী সংলগ্ন বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে নুতন বসতবাড়ি স্থাপন করেন। কিন্তু মানুষ যতই দূরদর্শী হোক না কেন অনাগত প্রজন্ম কি করবে, কোথায় বাড়ী বানাবে বা বসবাস করবে তা একমাত্র মহান আল্লাহ্-তায়ালাই ভাল জানেন। অনেক শখ আর শান শওকত দিয়ে বানানো বাড়িঘরও পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের প্রয়োজনসহ নানাবিধ কারণে অকারণে পরিত্যাগ করে। আজকাল সবাই শহর কেন্দ্রিক। নুতন প্রজন্ম যাদের জন্ম ও বেড়ে উঠা শহরে তাঁরাত উৎসব পার্বণেও গ্রামের বাড়ীতে যেতে চায় না। প্রায় সব শহরকেন্দ্রিক পরিবারের একই অবস্থা। নজিরউদ্দিন সাহেবের গ্রামের বাড়ীও অনেকটা অবহেলায় প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে।

উজিরপুরে মনির চৌধুরী ও সরফ চৌধুরী সাহেবের কবরগাহ্

ওমর চৌধুরী

ওরফে উমির মিয়া, শরাফত মিয়ার সাহেবের তৃতীয় ছেলে। মৌলভীবাজার হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় পিতা সরফ চৌধুরী ইন্তেকাল করলে লেখাপড়ায় ইতি টানেন। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনীতে লিটারেট কনস্টেবল এর চাকুরী পেয়েও যোগ দেন নি। সেই সময় এই পদে যোগ দিয়ে অনেকেই প্রমোশন পেয়ে পরবর্তীতে ডেপুটি/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যন্ত হয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তিনি লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত মেম্বার ছিলেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। মেয়েকে তিনি হবিগঞ্জ সদরের মশাজান সৈয়দ পরিবারে বিয়ে দেন।

ইউনুসুর রহমান চৌধুরী

ওরফে ইউনুস মিয়া, আব্দুল গনি চৌধুরী ওরফে আমরু মিয়ার একমাত্র সন্তান। তিনি বিচক্ষন, খুবই বৈষয়িক এবং সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাল্য বয়সে পিতৃহারা এবং মায়ের অন্যত্র বিয়ে হওয়াতে তিনি আপন চাচা আব্দুল বারী চৌধুরী ওরফে আলফি মিয়া কর্তৃক লালিত পালিত হোন এবং পরে পরিণত বয়সে চাচার একমাত্র মেয়েকে বিবাহ করেন। চাচা আলফি মিয়ার মৃত্যুর পর একান্নবর্তী পরিবার হওয়ার কারনে সংসারের হাল ধরেন এবং নাবালক শ্যালকদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তত্বাবধানে থেকে বড় শ্যালক বজলু মিয়া ব্রিটিশ আমলে বি, এ, এল, এল, বি পাশ করেন। তিনি পঞ্চায়েতের সভাপতি (সরপঞ্চ) হিসাবেও অনেকদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক। মেয়েকে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছিরনগর থানার অন্তর্গত গুনিয়াউক গ্রামের বড়বাড়িতে বিয়ে দেন। তাঁর বড় ছেলে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে ফরিদ মিয়া ব্রিটিশ আমলে বি,এ পাশ করে সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং এবং পাকিস্থান আমলে কো-ওপারেটিভ সোসাইটিতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। তিনি নজিরউদ্দিন সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সচিবালয়ে এক লিফট দূর্ঘটনায় তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নুর আলী চৌধুরী

তিনি মওলানা দেলোয়ার চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি চৌধুরী পরিবারের অন্যদের তুলনায় আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। আসগর চৌধুরীর একমাত্র উত্তরপুরুষ হিসাবে তাঁর বংশধরেরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট আছেন।

মোঃ কছিরউদ্দিন চৌধুরী

ওরফে কছির মিয়া, মোঃ মনির চৌধুরী ওরফে মনির মিয়ার প্রথম পুত্র। তিনি খুবই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বৈষয়িক ও সুপরিচিত লোক ছিলেন। তিনি যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন। উচ্চ-বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এরপর থেকে তিনি সংসার কর্মে পিতা মনির চৌধুরীকে সাহায্য সহায়তা করতেন। মনির চৌধুরীও কিছুদিনের মধ্যে ছেলে

কছির মিয়ার হাতে সংসারের দায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হন। তিনি খুবই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কনিষ্ঠ ভাইদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহিত করেছেন এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা করেছেন। উনার প্রেরণাতেই ছোট ভাই নজিরউদ্দিন চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করেন। তিনি একজন সুবিচারক হিসাবেও এলাকাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন গ্রাম্য বিচার সালিশে উপস্থিত হয়ে সুবিচার নিশ্চিত করতেন। তিনিও পঞ্চায়েতের সভাপতি (সরপঞ্চ) হিসাবে অনেক দিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। তাঁর বড় ছেলে সালেহ চৌধুরী এবং মেঝ ছেলে সাইদ চৌধুরী ইংল্যান্ড প্রবাসী।

আব্দুল লতিফ চৌধুরী (নানু মিয়া)

তিনি আরশাদ চৌধুরীর দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতা আরশাদ চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে করে হবিগঞ্জের বাহুবল থানার অন্তর্গত ভাদেশ্বর গ্রাম থেকে উজিরপুরে স্থানান্তরিত হন। নানু মিয়া শরাফত মিয়ার ফুফাতো ভাই ও ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। তাঁর অধঃস্থন বংশধরগণ উজিরপুরেই অবস্থান করছেন। বর্তমানে এই পরিবারের সবাই অন্যত্র বসবাস করায় তাঁদের পূর্বপুরুষের উজিরপুরের বসতবাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

মজিদউল্যা এবং ওয়াজিদউল্যা

উভয়ে পরস্পর ভাই ছিলেন। তাঁরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম লরছপুর থেকে উজিরপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। মজিদউল্যা আরশাদ চৌধুরীর সাথে অত্র এলাকায় একটি তালুকে অংশীদার ছিলেন। উজিরপুরে তাঁদের বসতবাড়ী আরশাদ চৌধুরীর বাড়ীর লাগোয়া উত্তরের অংশে অবস্থিত। তাঁরা পরবর্তীতে চৌধুরী পরিবারের একাংশের সাথে আত্মীয়তা সুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। মজিদউল্যার মেয়েকে আব্দুল গনি চৌধুরী ওরফে আমরু মিয়া বিয়ে করেন। আব্দুল বারী চৌধুরী ওরফে আলফি মিয়া ওয়াজিদউল্যার মেয়েকে বিবাহ করেন। মজিদ উল্যার পৌত্র ঠাণ্ডা মিয়ার দ্বিতীয় ছেলে আব্দুল মতিন চৌধুরী ওরফে ফুরুক মিয়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডি,জি,এম হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ওয়াজিদউল্যার দুই পৌত্র ছিলেন বেলায়েত মিয়া এবং মুস্তফা মিয়া। তাঁদের উত্তরপুরুষগণ অন্যত্র বসবাস করছেন।

- অনেকের কেতাবি নাম জানা না থাকায় প্রচলিত নাম ব্যবহার করা হয়েছে।
- বংশানুক্রমটি আংশিক। বর্তমান প্রজন্মের অনেকের নাম না জানা থাকায় সবাইকে এতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রফেসর মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের পরিবার পরিজন

মরহুমা বেগম আতিকুন্নেছা চৌধুরী

নজিরউদ্দিন সাহেবের সহধর্মিণী। পিতাঃ মোঃ সরওয়ার চৌধুরী ওরফে চাঁন মিয়া সাহেব। গ্রামঃ দরিয়াপুর সাহেববাড়ী, উপজেলা ও জেলাঃ হবিগঞ্জ সদর। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ হিফজুর রহমান চৌধুরী রুকন

নজির উদ্দিন সাহেবের প্রথম পুত্র এবং এই বইয়ের লেখক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ঢাকায় বসবাসরত। স্ত্রী; মিসেস শবনম চৌধুরী এম, এ, বি, এড, পিতা মরহুম জালাল উদ্দিন চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ। তিনি ঢাকায় একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তাদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে বি, বি এ, এম, বি, এ সমাপ্ত করে ব্যাংকার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বিবাহিতা, স্বামী; নফিস আহমেদ চৌধুরী আই, সি, এম, এ, পিতা মোঃ রফি আহমেদ চৌধুরী প্রাক্তন সচিব বাংলাদেশ সরকার। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসীতে বসবাসরত। তাঁদের দুই কন্যা; যাহ্‌রা এবং আজরা, উভয়ে সেখানে লেখাপড়া করছে। স্থপতি নফিস মোস্তাফা চৌধুরী এই দম্পতির প্রথম পুত্র। তিনি বিবাহিত, স্ত্রী; স্থপতি সৈয়দা সামারা হামিদ, পিতা মরহুম সৈয়দ হামিদুল হোসেন এম, এস, সি (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়), অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক সিমুজী কন্সট্রাকশন কোম্পানি (জাপান)। তাঁরা উভয়ে চাকুরীরত এবং ঢাকায় বসবাসরত। তাঁদের কন্যা আম্মারা চৌধুরী কেজি লাভেলে পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার তাওফিক আনাম চৌধুরী এই দম্পতির দ্বিতীয় পুত্র। সে একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার।

মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী হারুন

বি, এ, এল, এল, বি। দ্বিতীয় পুত্র। ছাত্র অবস্থায় সুনামগঞ্জ ছাত্র লীগের একজন ডাকসাইটে নেতা ছিলেন। সরকারের কাস্টমস ও এক্সাইজ কর্মকর্তা হিসাবে অবসর গ্রহণ করে এখন ঢাকা ও হবিগঞ্জে আইন পেশায় নিয়োজিত। তিনি ঢাকায় বসবাসরত। তাঁর স্ত্রী সৈয়দা ফায়জুন্নাহার চৌধুরী একজন গৃহিণী। এই দম্পতির কোন সন্তান-সন্ততি নেই।

মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী শাহিন

তিনি স্নাতক এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের ছোট ছেলে। তিনি হবিগঞ্জে তাঁর পিতার বাসায় বসবাসরত। ব্যবসা সহ গ্রামের বাড়ীর সহায় সম্পত্তির দেখভাল করছেন। তিনি একসময় জাসদের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সময় বানিয়াচং ও আজমিরিগঞ্জ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি বিবাহিত। স্ত্রী সৈয়দা হেলেনা চৌধুরী একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রী। এই দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে। উভয়ে পড়ালেখা করছে। ছেলে সিলেট মেডিকেল কলেজে এবং ময়ে সিলেটে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে অনার্স অধ্যয়নরত।

মাহমুদা চৌধুরী রাজিয়া

স্নাতক এবং নজিরউদ্দিন সাহেবের প্রথম সন্তান। স্বামী: মরহুম মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী; যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের এক ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলে সফট-ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েরাও বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমাপ্ত করেছে। সবাই যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসরত।

মাশহুদা চৌধুরী রেহানা

স্নাতক এবং পি, টি। দ্বিতীয় মেয়ে। স্বামীঃ মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ জামশেদ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। রেহানা হবিগঞ্জে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং হবিগঞ্জ শহরে বসবাসরত। তাঁর একমাত্র সন্তান ডাঃ সৈয়দা ইফতিসাম আইরিন একজন চিকিৎসক এবং বিবাহিত। স্বামী ডাঃ সামছুর রহমান রাহেল।

মাহফুজা চৌধুরী সাইদা

এম, কম, এল, এল, বি। তৃতীয় মেয়ে। স্বামীঃ এ, এম আমির হোসেন। উভয়ে ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী। সাইদা বর্তমানে সহকারী এটর্নি জেনারেল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সে আওয়ামী লীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ কেন্দ্রীয় নেত্রী। তিনি ঢাকায় বসবাসরত। তাঁদের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। ছোট মেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে পড়াশুনা করছে।

মসউদা চৌধুরী হাস্না

বি, এ, এল, এল, বি। চতুর্থ ও ছোট মেয়ে। স্বামীঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হবিগঞ্জ জজকোর্টের একজন স্বনামধন্য সিভিল আইনজীবী। হাস্না নিজেও হবিগঞ্জ জজকোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে এম, বি, বি, এস ডাক্তার এবং ছোট মেয়ে স্নাতক। ছেলে মাত্র ১৮ বছর বয়সে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান ও একটি ভাল ছেলে অকালে ঝরে পড়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সে জড়িত থাকত। প্রায়শই স্কুল কলেজের প্রতিযোগিতামূলক যে কোন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করত। এস, এস, সি পরীক্ষায় সে গোল্ডেন জি, পি, এ – ৫ পেয়েছিল। মহান আল্লাহ্ রাব্বিল আলামিন তাঁকে বেহেশত নসীব করুন।

মোঃ সরফ চৌধুরীর উত্তরপুরুষ; কয়েকজন

এ, কে, এম সালেহ উদ্দিন চৌধুরী

তিনি সরফ চৌধুরীর পৌত্র মরহুম জনাব কছিরউদ্দিন চৌধুরীর সাহেবের প্রথম পুত্র। তিনি আবুল কাসেম নামেও পরিচিত। তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন রেডিও পাকিস্থানের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। সিলেট ও ঢাকা বেতারে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড গমন করেন। পরে ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে বসবাস করছেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। মেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমাপ্ত করে সেখানকার একটি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করছেন। ছেলে ডাঃ ইমরান আহমেদ চৌধুরী যুক্তরাজ্য থেকে মেডিকেল গ্রাজুয়েশন সমাপ্তের পর রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন থেকে মেম্বারশীপ ডিগ্রী নিয়ে নিজের ক্লিনিকে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

এ, বি, এম সাইদ উদ্দিন চৌধুরী

তিনি কছিরউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাণিজ্যে স্নাতক। ব্যবসা করতেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যুক্তরাজ্য গমন করেন। পরে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর তিন ছেলে। বড় ছেলে সাকিব আইন বিষয়ে পড়াশুনা সমাপ্ত করে এখন যুক্তরাজ্যে সলিসিটর হিসাবে কাজ করছে। মেঝ ছেলে আলভী ইঞ্জিনিয়ার। ছোট ছেলে স্কুলে পড়ছে।

এহতেশামুল হক চৌধুরী রাফি

তিনি সরফ চৌধুরীর পৌত্র মরহুম জনাব দবিরউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের পুত্র। তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। তিনি হবিগঞ্জ শহরে বসবাসরত। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলে মুক্তাদির চৌধুরী (অনিক) ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বড় মেয়ে স্নতক সম্পন্ন করেছে ছোট মেয়ে লেখাপড়া করছে।

গোলাম আকবর চৌধুরী মকসুদ

তিনি সরফ চৌধুরীর আরেক পৌত্র মরহুম জনাব গোলাম কুদ্দুছ চৌধুরী সাহেবের একমাত্র পুত্র। তিনি বি, এস, সি, বি, এড। উজিরপুর সংলগ্ন সন্দল পুর হাই স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি স্কুলটির প্রধান শিক্ষক। তিনি হবিগঞ্জ শহরে বসবাসরত। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে দুজনেই স্নাতকোত্তরে পড়াশুনা করছে।

পুরানো দলিল সমূহঃ
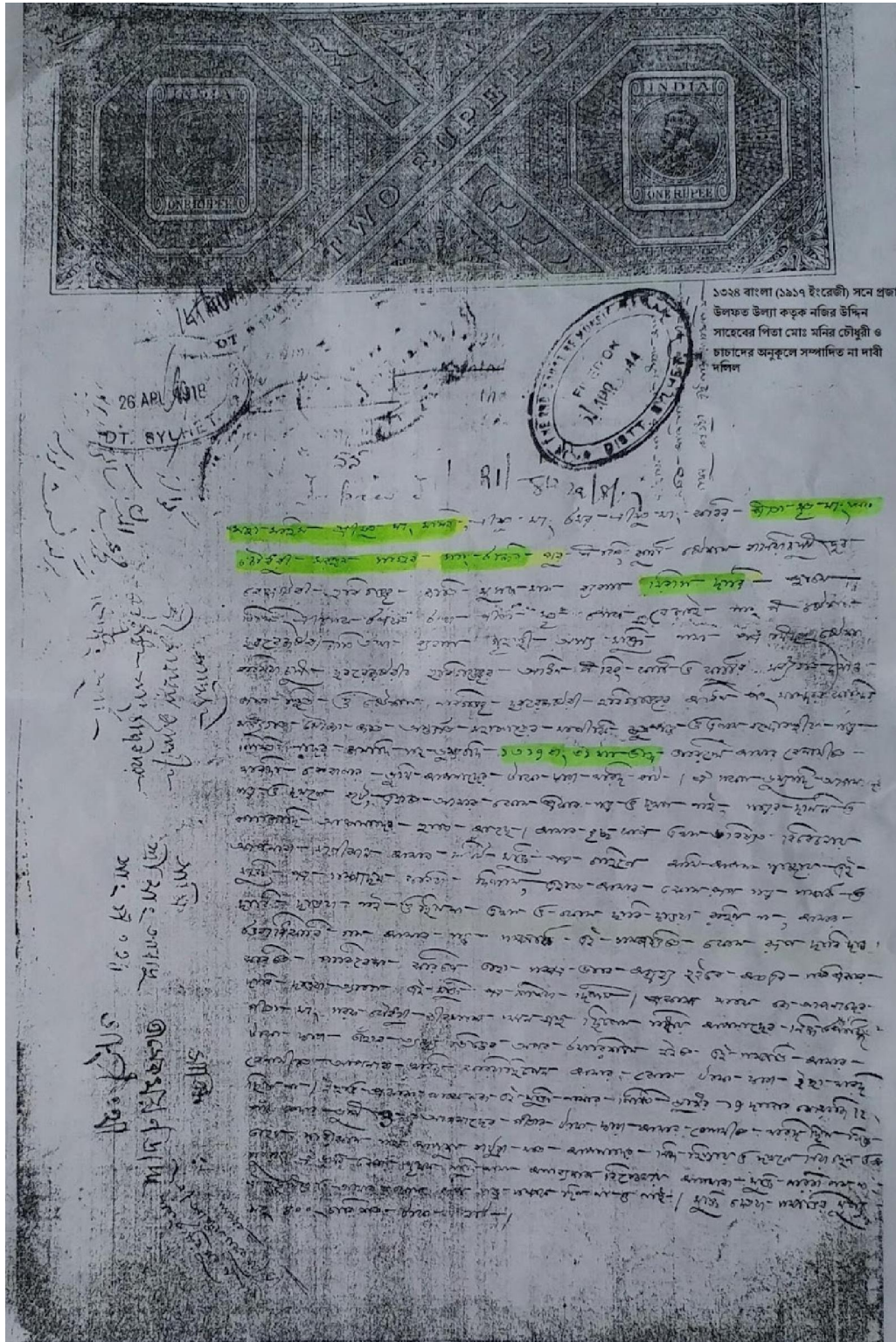
মোঃ মনির চৌধুরী ও তাঁর ভাইদের অনুকূলে কৃষক উলফত উল্যা কর্তৃক ১৩২৪ বাংলা (১৯১৭ ইংরেজী) সনে সম্পাদিত না দাবী দলিলের কপি।

২৮৬২৩/৯১ নং তালুক - জন্দি শুকুর (জৈনউদ্দিন শুকুর)

পরগনা - কুরশা, মউজা - হরি

11 NOV 1954

নজিরউদ্দিন সাহেবের পূর্বপুরুষ জৈন উদ্দিন শুকুর চৌধুরী কর্তৃক খরিদ-কৃত তালুক, নং ২৮৬২৩/৯১, (জন্দিশুকুর; জৈন উদ্দিন শুকুর নামের আঞ্চলিক রূপ)

মোঃ আরশাদ চৌধুরী কর্তৃক খরিদ-কৃত তালুক, নং ৩১৩৩৯/১,
(মজিদউল্যা ও মোঃ আরশাদ) পরগণা – কিং কুরশা,
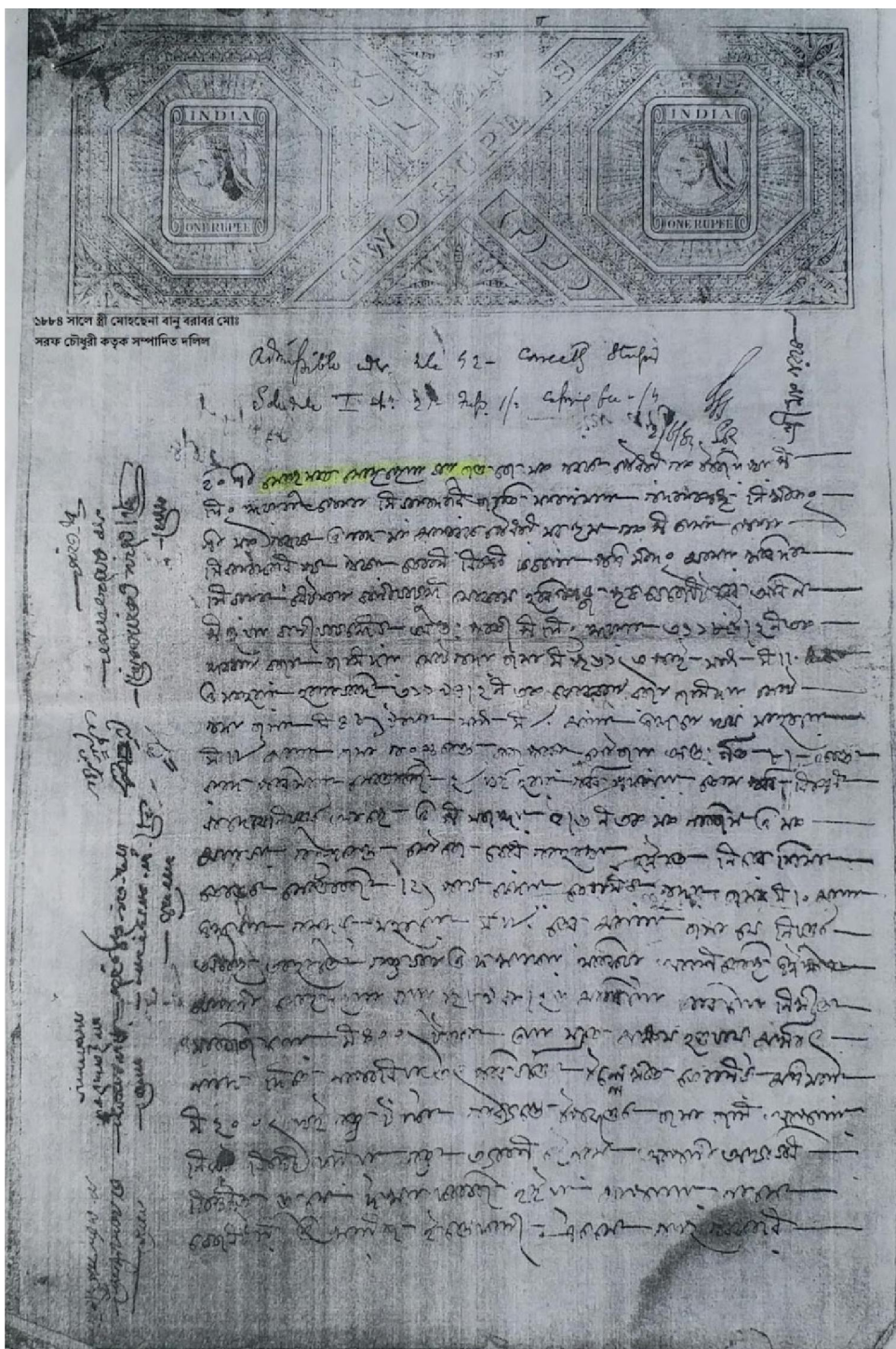
সরফ চৌধুরী কর্তৃক স্ত্রী মোহছেনা বানুর অনুকূলে ১৮৮৪ সালে সম্পাদিত দলিলের কপি। এতে সরফ চৌধুরীর পিতা মোঃ আশরাফ চৌধুরীর নাম উল্লেখিত আছে।

মোঃ সরফ চৌধুরী কর্তৃক ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওর এলাকায় খরিদ-কৃত ভূসম্পত্তি; পাট্টা নং – ৫৯০৯৯/১০৭৯, ৫৯১৪২/১২৭

পারিবারিক এলবাম:

প্রফেসর মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী

বেগম আতিকুন্নেছা চৌধুরী

লেখক ও মিসেস শবনম চৌধুরী

নাতনী যাহ্‌রা

মেয়ে তাবাচ্ছুম

এম, বি, এ সমাবর্তনে মা-মেয়ে

ডান থেকে লেখক, ১ম ছেলে, ২য় ছেলে ও জামাতা

ছোট ছেলে তওফিক

মেয়ে-জামাই এবং তাঁদের দুই মেয়ে যাহ্‌রা ও আজরা

শবনম চৌধুরী ও বেয়াই রফি আহমেদ চৌধুরী

বড় ছেলে নফিস ও বৌমা সামারা হামিদ

বড় ছেলে, বৌমা এবং ওদের মেয়ে আম্মারা
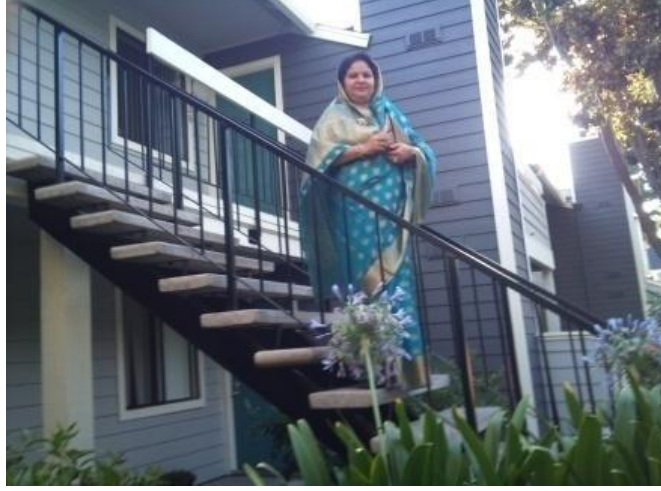
মেয়ের বাড়ীতে – সিলিকন ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া

সস্ত্রীক লেখক, পিছনে জামাতা – ইউ, এস, এ

ডিজনিল্যান্ড পার্ক, এনাহেইম (লস-এঞ্জেলস), আমেরিকা

ডিজনি-ল্যান্ড পার্ক, এনাহেইম (লস-এঞ্জেলস), আমেরিকা
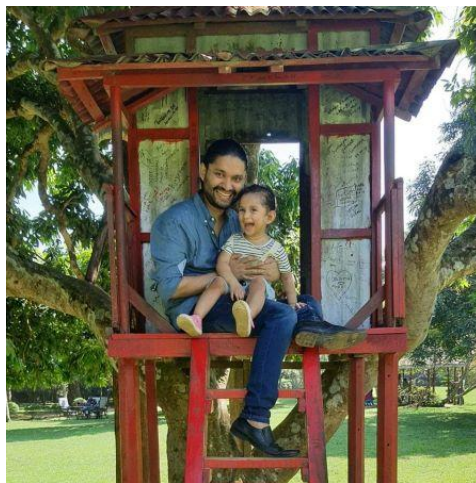
নফিস ও তাঁর মেয়ে আম্মারা

ইউনিভার্সেল ষ্টুডিওজ, হলিউড

সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুলের ১২৫ বছর পূর্তিতে লেখক বাম থেকে দ্বিতীয় (দন্ডায়মান)

আমাদের সাথে ছেলের শ্বশুড়/শ্বাশুড়ী এবং মিঃ/মিসেস আব্দুল হামিদ চৌধুরী (প্রাক্তন সচিব)

বড় বৌমা সাথে ওর চাচা সৈয়দ হক